আলোকঝারি

আলোকঝারির দিনগুলিকে

রাঁধলা কী? ও বুড়ি?

শিলি বলল।

ফোক্‌লা দাঁতে হাসি ফুটল কিরণশশীর।

এখনও কিসু রাঁধি নাই। রাঁধবোনে। বুড়ির আবার রাঁধারাধির কী। দুইডা ভাত ফুটাইয়া লম্যুআনে। একটুক ঘি ফ্যালাইয়া, দুইডা আলু দিয়া দিমু ভাতে। আর কাঁচা মরিচ তো আছেই।

রোজ রোজ এত দেরি কইর‍্যা রান্ধো ক্যান্। শরীলডা এক্কেরেই যাইব। তখন দেখবনে কেডা'

ক্যান্? তুইই দেখবি। দেখবি না?

চুপ করে রইল শিলি। উত্তর দিল না।

কীরে ছেমড়ি! কথা কস না ক্যান?

কী কম্যু? কেডা কারে দ্যাহে? শরীল, ভাইঙ্গা গ্যালে কেউই দেখব না কইয়া দিলাম।

হে তো জানি। কিন্তু এ পোড়াকপাইল্যা শরীল একটাদিনের লগেও কি খারাপ হয়? পাথর দিয়্যা গইড়া থুইছিল আমারে ব্রহ্মা।

হাসল শিলি।

কিরণশশীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, শিলি হেসে বলল, বালাই-ষাট। খারাপ হইয়া কাম নাই। এই কইর‍্যাই যেন পার হইয়া যাও বুড়ি।

কইছস ঠিক ছেমড়ি। দেহিস্ তুই। আমি পড়ুম আর মরুম।

'তা, তিনি আইতাছেন কবে? শিলি ভুরু তুলে জিগগেস করল।

এহনে বুঝছি। তাই ক'! তর এত ঘন ঘন আসন-যাওন আমার ছাওয়ালের লাইগ্যাই! কীরে? ভুল কইছি? ক'?

বাড়ির চারপাশ থেকে নানারকম পাখি ডাকছিল। বড় বাঁশঝাড়ের মধ্যে বাদামি বড় পাখিটা ধরে ধরে পোকা খাচ্ছিল। সকালের হাওয়াতে বাঁশে বাঁশে কটকট আওয়াজ হচ্ছিল। পাশের ডোবাতে, শাপলা যেখানে ঢেকে রাখেনি জল; সেখান থেকে সাত-সকালের নরম সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে এসে, তেঁতুলগাছের পাতায় পড়ে, চারদিকে আলোর চিরুণির মতন তিরতির করে কাঁপছিল।

কিরণশশী, শেষ চৈত্রর প্রথম সকালের রোদে, বড়ঘরের মাটির দাওয়াতে দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিলেন।

তুমি একটা যাচ্ছাতাই। বুড়ি।

তাত কইবিই। আমারে ভালো কইর‍্যা স্যাবা-যত্ন কর। পুতন আইলে অইব কী? ছাওয়াল আমার বড্ডই মাতৃভক্ত। আমি যদি "না" কইর‍্যা দেই, অইবই না বিয়া। বুঝছস ছেমড়ি। আমার কথাই হইতাছে গিয়া শ্যাষ কথা।

বিয়ের কথাতেই, শিলির চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হাসিমুখে বলল, হঃ। কী আমার ছাওয়াল। তারে বিয়া করনের লইগ্যা আমি তো কাইন্দা বেড়াই য্যান। তুমি নিজ্যা নিজ্যা ছাইভস্ম ভাইব্যাই মরো।

তাইতো।

হাসলেন কিরণশশীও।

বললেন, আচ্ছা। দেহি তরে কোন রাজার পুত আইয়া বিয়া করে।

শিলি ভুরু নাচিয়ে, চোখে ঝিলিক তুলে বলল, হ। হ। দেইখ্যো আনে। আমারে তুমি ভাবতাছোটা কী? তোমার ছাওয়ালরে বিয়া কেডা করে?

যা ভাবতাছি, ঠিকই ভাবতাছি।

একটু পরে শিলি বলল, দাও দেহি, তোমার চাউলডা ধুইয়া আনি ইন্দারা থিক্যা।

লইয়া যা। কুলায় বাইর কইর‍্যা থুইছি। হবিষ্য-ঘরেই রাইখ্যা আইছি।

শিলি চলে গেল হবিষ্য-ঘরের দিকে।

কিরণশশী, চলে-যাওয়া শিলির দিকে চেয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বড় ভালো এই মেয়েটা। রায়দের বাড়ির ছোট তরফের ছোট ছেলের মেয়ে। ছোট তরফের রায়রা কোনোরকমে টিমটিম করে বেঁচে আছেন এখনও। পয়সা কোনোদিনও ছিল না। বংশ পরিচয় ছিল। মানুষ ওঁরা ভালো। ভালো বলেও বটে এবং কুঁড়ে বলেও বটে; টাকা পয়সার দিকে কোনোদিনও বিশেষ লোভ ছিল না। ঘর বাড়ি ছেড়ে উত্তরবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ওরা সকলেই নিম্ন আসামের এই কুমারগঞ্জে এসে একটু মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছেন। তাও চল্লিশ বছর হতে চলল।

এঁদের কারও দেশ ছিল বগুড়া, কারও নিলফামারি, গাইবান্ধা, ডিমলা, কারও পাবনা বা রাজশাহী। কিরণশশীদের দেশ ছিল বগুড়ায়। এখনও পেছনে তাকালে, ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা। মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখনও কেন যে মনে পড়ে! চেনা জানা মানুষজন আর নেই। অল্পবয়সিরা চেনে না।

পুরানো পাড়া আর চেনন যায় না। বাড়িটার মধ্য দিয়ে চওড়া পিচের রাস্তা চইল্যা গেছে গিয়া। ঐত্থনে নাকি এয়ারপোর্ট হইবে শুইন্যা আইছে হেরম্ববাবুর ছোট পোলায়। স্যা গত বছর পূজায় গেছিল, বগুড়ায়। অনেক কথাই কইল। সেই তাগো হরিসভার পূজাও আর হয় না। মস্ত মসজিদ উঠছে। ঈদের সময়ে উট বলি হয়। কোন শ্যাখেরা নাকি পাঠায় সে সব। মকবুল মিঞা, যে নাকি ঘরামির কাজ কইর‍্যা খাইত, এহনে মস্ত বড়লোক হইছে। ঢাউস গাড়ি চড়ে।

ভরসার কথা এই যে, পিছনের কথা মনে করার সময় তাঁর নেইই। হইলে হইছে। বদলাইয়া ত যাইবই। কুমারগঞ্জও কি আর সেই আগের কুমারগঞ্জ আছে নাকি। সবই বদলাইয়া গেছে। বদলাইয়া গেছে মানুষের মন, মানুষের দৃষ্টি। সবকিছুই এই কয় বছরে বদলাইয়া গেছে। বড় মানুষ। বড় ধুলা। বড় আওয়াজ। বড় খাই খাই, নোংরামি, চাইরধারে। এর মধ্যে কিরণশশীর আর বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা নাই। এহনে, মানে মানে যাইতে পারলেই হয়।

ভাবেন তিনি।

টিনের ছাদে বইস্যা একটা দাঁড়কাক ডাকতাছিল। লালরঙা। মাইয়াগো অসভ্য জায়গার মতন লাল তার মুখের ভিতরখান। অসভ্য-অসভ্য দেখায়।

কুমারগঞ্জের সকলেই বলে, কিরণশশী বড়ই অভাগী। দেশ ছেড়ে আসার পর আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাট, গোয়ালপাড়া, ডিঙ্গডিঙ্গা, গোলোকগঞ্জ, ফকিরাগ্রামে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

অনেকেই অবশ্য, যেমন কিরণশশীর শ্বশুরমশাই; চাষ-বাস, পাটের কারবারের কারণে এখানে অনেক আগে থেকেই ছিলেন। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। তার মাথা গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে আর লেজ রয়েছে তিস্তায়। দেশ ভাগ হবার আগে পুব-বাংলা থেকে বড় বড় মহাজনি নৌকো

করে পাট আসত এই নদী বেয়ে। পাটের বড় বড় আড়ত, গদিঘর, সব ছিল তখন প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু বাড়িতেই। লাল আর সাদা, মিহি আর মোটা, নানারকম পাটের গন্ধে, শীতকালে পাট ওঠার পর, পুরো এলাকাটা ম' ম' করত যেন। গেছে সে সব দিন।

অনেক ভেসে আসা পরিচিত পরিবারই এসে এখানে আবার নতুন করে শিকড় গেড়েছেন। ব্যাবসা, চাকরি ইত্যাদিতে কুচবিহার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং কলকাতাতে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন। যদিও আগে আসা বা পরে আসা সকলেরই মূল এখনও রয়ে গেছে এই ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাটেই।

সাত-সাতটি সুন্দর, কৃতী যুবক ছেলেকে এবং তাঁর স্বামীকেও হারিয়েছেন কিরণশশী। আছে এখন এই সবেধন পুতন, সবচেয়ে ছোট ছেলে। পুতনের সঙ্গে তাঁর বয়সের এতই তফাত যে, মনে হয় তিনি বুঝি মা নন, পুতনের ঠাকুমা।

পুতন, জলপাইগুড়ির এক চা বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ধুবড়ি থেকে বি. কম. পাশ করে কলকাতায় গেছিল তাঁর ভাসুরের ভগ্নীপতির অডিট অফিসে খাতা লেখার কাজ শিখতে। এম-কমও পাশ করে সেখান থেকেই। তারপর তাঁদেরই সুপারিশে, তাঁদের মক্কেলের এই চা বাগানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যোগ দিয়েছে বছর তিনেক হল।

পুতনের কাছেই শুনেছিলেন কিরণশশী যে, একসময়ে বেশিরভাগ নামি চা বাগানই ছিল বাঙালিদের। নয়তো সাহেবদের কোম্পানির। এখন সাহেবদের কোম্পানিগুলো কিনেছে বড় বড় মাড়োয়ারিরা আর বাঙালিদেরগুলো তাদের চেয়ে ছোট মাড়োয়ারিরা। হাতে বাঙালিদের মাত্র কয়েকটি বাগানই আছে এখন। হাতে গোনা যায়।

পুতন, বছরে একবার করে আসে কুমারগঞ্জে, একমাসের জন্যে। এবার আসবে বৈশাখের প্রথমে। চিঠি লিখেছিল যে, এবারে নববর্ষটা কুমারগঞ্জেই কাটাবে। আর সাত বোশেখির মেলা দেখতে যাবে অনেকদিন পর, আলোকঝারি পাহাড়ে।

শিলি এসে বলল, তোমার ভাত চড়াইয়া দিয়া আইলাম। একটু মটরের ডাইলও ধুইয়া ছড়াইয়া দিছি। দুইডা আলু আর দুই টুকরা কুমড়া। সময়মতো নামাইয়া লইওআনে। আমি যামু?

আইসাই যামু যামু করস্ ক্যান্ রে ছেমড়ি? ঘোড়ায় জিন্ দিয়া আইছস নাকি?

হেইরকমই পেরায়। বাবার যে জ্বর হইছে, তাইই বুঝি কয় নাই তোমারে?

কে?

হোন্দলের মায়ে?

না তো! হোন্দলের মায়ের কথা ছাড়ান দে। আয়, আর যায়। যার ঘরে চাইর-চাইরটা পোলাপান, হেই মায়ে কি কোথাওই মন লাগাইয়া কাম কইরবার পারে? ক দেহি? ক্ষুধায় কান্দে সেগুলান। আর তার ভাতার তো দিনরাত মদ গিল্যা পইড়্যাই থাহে। হে বেচারিই বা করেডা কী?

তুমিও তো একলা বুড়ি মানষি। তোমারে যদি নাইই দ্যাহে, তো ছাড়াইয়া দ্যাও না ক্যান্? তোমারে দ্যাহে কেডায়?

থাক। থাক। অমন কথা কইস না। ছাড়াইয়া দিলে, পোলাপানগুলানরে লইয়া এক্কেরে না-খাইয়া মরব।

পোলাপান হয় ক্যান তাগো? যাগো খাওয়াইবারই মুরদ নাই।

সে হোন্দলের মায়ের কী দোষ। পোলাপান হয় ক্যান তা জিগাইবার লাগে হোন্দলের বাপরে। এই পুরুষ জাতটার হক্কলই এক্কেরে বে-আক্কাইলা।

শিলি আর কথা বাড়াল না। ও ভুলেই গেছিল যে, পুতন কিরণশশীর নিজের আট নম্বর এবং

শেষ ছেলে। মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। দুটি মারা গেছে কৈশোরে। একটির বিয়ে হয়েছে কুচবিহারে। তার স্বামী রেলের টিকিট কালেক্টর।

খুব সময়মতো মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল ও।

পুরুষমানুষগুলোর সত্যিই কি কোনো আক্কেল ছিল না? ছিল না শুধু নয়. এখনও নেই। নইলে হোন্দলের বাবায় এমনডা করে। ছিঃ ছিঃ।

চলি বুড়ি।

আরে। তর বাবার না জ্বর আইছে কইলি, তা এহনে বাবা আছেডা ক্যামন, তাতো কইয়া গেলি নারে ছেমড়ি। কী যে করস।

ভালো নাই। জ্বর উইঠ্যা গেছিল পাঁচ। এখন নাইম্যা দুই হইছে।

ঔষধ টৌষধ দিছস কিছু? না, ভালোবাসাতেই ছাইড়্যা যাইব গিয়া জ্বর?

দিছিতো! শৈলেন ডাক্তারের ভাইরে আনাইছিলাম তামাহাট থিক্যা। কইয়া গ্যালেন, মাথার নিচায় কচুপাতা দিয়া কইয্যা জল ঢাইল্যা যাও আর কুইনিন মিক্সচার চালাইয়া যাও!

হইছেডা কী? ম্যালোরি নাকি? তাইলেই খাইছে।

আঃ। বুড়ি, তোমারে লইয়া পারিনা আর। তোমার ছাওয়াল হইল গিয়া ক্যালকাটা উনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস এম.কম. আর তুমি ম্যালেরিয়ারে কও ম্যালোরি? এক্কেরে হোন্দলের মা হইয়া গ্যালা দেহি।

ওই হইল। বুঝছস তো তুই। বোঝন যাইলেই হইব। ইংলিশ-ফিংলিশ আমি জানুম কোত্থিকা এত? দেহি। আজ বিকাল বিকাল যাইয়া একবার দেইখ্যা আসুমনে নরেশরে।

তোমারে কে দ্যাহে তার ঠিক নাই। তোমার কাম নাই যাওনের। তেমন যদি বুঝি তো আমিই পাঠামু আনে ক্যাবলারে। তোমারে বইল্যা যাইবো আইস্যা। খামকা আইস্যা ভিড় বাড়াইও না তো!

আমি তো ভিড়ই বাড়াই শুদামুদা। এহন আর কোন কামে লাগি কার?

অভিমানের সুর লাগল গলায়, কিরণশশীর।

তারপর বললেন, তর কাকায় বাড়ি নাই বুঝি? ঘরে পুরুষ মানুষ নাই একজনও?

নাঃ। শিকারে গেছে গিয়া আবু ছাত্তাররে লইয়া। ধুবড়ি থিক্যা কোন সাহেব আইছে নাহি শুনি। পুরুষ মানুষ লইয়া, কোন কাম আমাগো। বেকামের লোক সব। কামের মধ্যে এক কাম। সে কাম ত কুত্তায়ও করে। বাহাদুরিটা কীসের অত?

সবসময় শিকার-শিকার। কী যে বাতিক হইছে পরেশের। কাম-ধান্দা নাই। ঘরে একটা কচি মাইয়ারে ফ্যালাইয়া।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন কিরণশশী, তর বাবার জ্বর দেইখ্যা যায় নাই নিশ্চয়? পরেশ?

না তো কী! যখন চইল্যা গেল, তখন বাবায় তো বেহুঁশ।

কস কী তুই? কী খিটকাল। এমন বেআক্কাইল্যাও হয়। ক' তো দেহি।

চলি আমি এহনে।

যাওন নাই। আইসো।

তারপর গলা তুলে বললেন, আবার আসিস লো ছেমড়ি।

শিলি শুনতে পেল কিনা বুঝতে পারলেন না উনি।

না শুনে থাকলে না শুনুক। ওঁর বলার, উনি বললেন।

চ্যাগারের দরজা পেরিয়ে রক্ত-জবা গাছটার পাশ দিয়ে জোড়া-রঙ্গনের পাশ কাটিয়ে, পেছনের

বাঁশবনের মাঝের আলোছায়ার ডোরাকাটা পথে পুকুর থেকে সদ্য উঠে বাড়ির দিকে ফেরা হেলতে-দুলতে আসা, হিস-হিসানি তোলা, একপাল সাদা কালো বাদামি হাঁসেদের মধ্যে দিয়ে, তাদের দুভাগ করে নিয়ে; সাদা-কালো ডুরে-শাড়ি জড়ানো কালো ব্লাউজ-পরা শিলি; আলো-ছায়ারই মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ডান বগলের কাছে ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে একটু। নবীন যুবতীর সুগন্ধী ঘামে ভিজে গেছে বগলতলি। এ বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই বলে আঁচল দিয়ে ঢাকেনি শিলি, বগলতলি। পুরুষগুলোর চোখ দুপুরের কাকের মতন। কিরণশশী মুগ্ধ, স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর পথের দিকে, অনেকক্ষণ।

রঙ্গনের ডালে বুলবুলি হুটোপাটি করছিল। মৌটুসী পাখি ডাকছিল জবা আর যজ্ঞিডুমুরের পাতার আড়ালের ছায়া থেকে, প্রথম গ্রীষ্মের রোদের আঁচ বাঁচিয়ে। বাঁশবাগান থেকে ঘুরর্‌র-রঘু-ঘুঘুর-র্‌-র—ঘুউ করে কচি দুপুরের বিষণ্ণতাকে ছিদ্রিত করছিল এক জোড়া ঘুঘু। দমক দমক হাওয়ার, ধমকে ধমকে হলুদ ও লাল শুকনো কাঁটাল-পাতারা ঝাঁট দিচ্ছিল উঠোন, বিনা মাইনের মর্জিবাজ মুনিষের মতন থমকে থমকে।

নেশা লেগে গেল কিরণশশীর। শেষ চৈত্রর চড়া বেলায়ও চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল হঠাৎই, শিলির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। শোক এবং স্বপ্ন দুইই বোধহয় চোখের দৃষ্টিকে সমান ঝাপসা করে।

ভাবলেন উনি। বয়স হলে, সঙ্গীহারা হলে বড় ঘন ঘন ঝাপসা হয় চোখ।

কিরণশশী, বড় ঘরের দাওয়া থেকে উঠে চান করতে গেলেন বাথরুমে। ইন্দারার একপাশে কিছুটা জায়গা বাঁধান এবং ঘেরা। দরজা-দেওয়া। মেয়েদের চান করার জন্যেই বানিয়েছিলেন গোপেনবাবু। যখন বেঁচেছিলেন।

তাও অনেকদিনের কথা হয়ে গেল।

চান করতে করতে কিরণশশী নিজেকে দেখেন আর বড় কষ্ট হয় তাঁর। সুন্দরী নারীর যৌবন চলে যাওয়ার সময়ে অনেক কিছুই সঙ্গে টান মেরে উপড়ে তুলে নিয়ে যায়। আর যৌবন যখন থাকে, সে মদমত্ত উদ্ধত থাকে বলে, কোনো সুন্দরী যুবতীই দঃস্বপ্নেও ভাবে না একমুহূর্তের জন্যেও যে, যৌবন বড় অল্পসময়ের জন্য আসে, থাকে; চাঁপার বনের গন্ধের মতন। তারপর সেই শূন্য গহ্বর, সুখ-স্মৃতির গূঢ় গভীর গোপন সব অস্পষ্ট ছায়া বুকে বেঁচে থাকে। দেওয়াল থেকে, অনেকদিন ধরে টাঙিয়ে রাখা ছবি বা ক্যালেন্ডার হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চারদিকের অনুষঙ্গর মধ্যে সেই জায়গাটি বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে; সুন্দরী নারীর বার্ধক্যও তেমনই। সহজে, সুখে বইতে পারা কঠিন।

এই চান করার সময়টাতে প্রত্যেকদিনই নিজেকে অভিশাপ দেন কিরণশশী। তাঁর এই একলা জীবনে আর কোনো মোহ নেই। আশা নেই। ভালোলাগা নেই। বেঁচে আছেন, রান্না করছেন, ভাত খাচ্ছেন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখছেন, শুধু একটিমাত্র স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুতনের সঙ্গে শিলির দুটি হাত মিলিয়ে দিতে পারলেই তার বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। একদিন এই পলেস্তারা খসে-যাওয়া ইন্দারার পাশের করমচা-রঙা চানঘরে তার একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলের বউ, সুন্দরী যুবতী শিলি চান করবে।

নিজে চান করতে করতে ভাবেন, কিরণশশী। সুগন্ধি সাবান আর তেলের গন্ধে ঢেকে যাবে এই করমচা-রঙা মেঝের ক্ষারের গন্ধভরা চানঘরখানি।

তাঁর "পোলার বউ"। রাতভর বরের সোহাগ খেয়ে, নতুন সিঁদুর-লেপটানো কপাল আর লাল নাক নিয়ে, ব্রীড়ানম্র সোহাগি বিড়ালের মতন আড়ামোড়া ভেঙে, যখন পরিচিত অথচ একেবারে নতুন শিলি; গড়ানো সকালের চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে প্রথম সোহাগের পরের চান করার জন্যে,

তখন চান করতে করতে হাই তুলবে শিলি। সিঁদুরে-আমের ডালে বসা বসন্ত-বৌরি পাখি লোভীর মতো দেখবে সেই ছাদখোলা চানঘরের মধ্যের শিলির জলভেজা নগ্ন-রূপ। তারপর কচিপাতা-ভরা চিকন ডালে শিহর তুলে আমের বোলের গন্ধ চারিয়ে দিয়ে উড়ে যাবে, তার সখার কাছে।

হলুদ পাখিরা হলুদ ভাষায় কথা বলে। গিয়ে বলবে, আদর করো। আদর করো। আমার খুব আদর খেতে ইচ্ছে করছে গো।

তার হলুদ সখা তাকে বলবে, অনেক কাজ। সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।

পুরুষগুলো পৃথিবীময়ই সব একরকম। সে পাখিই হোক। কী মানুষ! মেয়েদের মনের কথা কেউই বোঝে না। ওদের সময় হলে, ইচ্ছে হলেই ওরা আদর করতে চায়। তখন "না" বললেই, ভারী গোস্‌সা।

বে-আক্কাইল্যা, এক্কেরেই বে-আক্ক্যাইলা এই পুরুষগুলান।

ভাবছিলেন নিজের মনেই, কিরণশশী।

কে জানে? পুতন, শিলির মতো মেয়ের যথার্থ দাম দেবে কী না। শিলিদের অবস্থা পড়ে না গেলে, শিলির মতো মেয়েকে বউ করার স্বপ্নও দেখতে পারতেন না কখনো কিরণশশী।

জ্বরটা দুপুরের দিকে বাড়ে, বিকেলে ছেড়ে যায়। আবার বেশি রাতে আসে।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই, দাদা ডাক্তার এই সুবাদেই গাঁয়ের ডাক্তার। এল-এম-এফ এর ডিগ্রিও নেই। কোয়াক।

ভাইয়ের ভিজিট দু টাকা আর দাদার আট টাকা। ভাই সামলাতে না পারলে দাদাকে ডাকে। তবে নরেশবাবুর বাড়াবাড়ি হলেও শৈলেন ডাক্তারকে আট টাকা ভিজিট দিয়ে ডাকার সামর্থ্য শিলির নেই। রোজগেরে বলতে তারা কাকা পরেশ একাই। কিন্তু শিকারের বাতিকেই তাকে খেল। মানুষটা ভালো। বিয়ে-থাও করেনি। জঙ্গলই তাকে পরীর মতো জাদু করেছে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলের সঙ্গেই।

কী যে ঘুরে বেড়ায় সারা বছর বনে-পাহাড়ে নদী-নালায়, তা সেই জানে। আর সঙ্গী হয়েছে বটে একজন। আবু ছাত্তার। তার বাবাকেও বাঘে খেয়েছে। তাকেও দুবার চিতাবাঘে ঠ্যাং কামড়ে আর ঘেঁটি কামড়ে ঘা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে ছিল একবার দুমাস, একবার তিনমাস। তাতেও কি মতি-গতি কিছু বদলাল? না। কিছুমাত্রই না।

কিন্তু নরেশের ভাই পরেশ, সে মানুষ নয়, ডাকাত। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে যে কী করে এমন হয়ে গেল, কে জানে। ওর সর্বনাশ করেছে আসলে ওই চালচুলোহীন, মাথার ওপরে পঞ্চাশটা মামলা-ঝোলা আবু ছাত্তার। ওটা মানুষ নয়ই! ওদের দোজখ-এর কোনো জীবই হবে।

আবু ছাত্তারের দুটি চোয়ালের দিকে তাকালেই শিলিরও ভয় করে খুবই। অথচ ছোটখাটো মানুষটি। মুখে হাসি লেগেই আছে।

মানুষের মুখের ভাবে পুরো মানুষ হয়তো কখনোই থাকে না, থাকে তার এক ফালি মাত্র। ঈদের চাঁদের মতো। কখন যে তাদের অমাবস্যা আর কখন পূর্ণিমা, তা বোধহয় এমন মানুষেরা নিজেরাও জানে না। বুঝতেও পারে না।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই জ্বরের হিসেব রাখতে বলে গেছেন। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হিকস-এর থার্মোমিটারের পারা নামিয়ে বাবার বগলতলায় দেয় শিলি। বার বার। ঘড়ি ধরে।

মা চলে গেছেন পাঁচ বছর হল। তারপর থেকে বাবার দেখাশোনা সব শিলিই করে। ক্যাবলাই বাড়িতে একমাত্র কাজের লোক। বেশি কাজ থাকলে, মুনিষ ভাড়া করে নেয়। চালের খড় নিড়িয়ে নতুন করে ছাইতে, ঘরামিকে ডেকে নেয়।

জ্বরটা দেখে, চান করতে যাবে ও। বাবাকে বার্লি খাওয়াবে ফিরে এসে। নীল রঙের পিউরিটি বার্লির কৌটোটায় বেশি আর নেই। আনতে দিতে হবে ক্যাবলাকে একটা। মধুর দোকান থেকে। সে যখন ছোট ছিল, মা তাকেই পাঠাতেন মুদির দোকানে। যেখানে সেখানে। মেয়েরা বড় হলেই তাদের জগৎ সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যায়।

গঙ্গাধর নদী বয়ে গেছে বাড়ির পেছন দিয়ে। ছোট যখন ছিল, তখন নদীতে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছে বন্ধুদের সঙ্গে। তখন সমবয়সি ছেলেরাও বন্ধু ছিল। ছেলে আর মেয়েরা যে আলাদা জাত, তা তখন অত বোঝেনি। উদবেড়ালের গর্ত ছিল নদীর উঁচু বালির পাড়ে। শুশুক ভেসে উঠত মাঝে মাঝেই। এই গঙ্গাধরই গিয়ে মিলেছে তিস্তাতে। একবার কাকার সঙ্গে শীতকালে গেছিল নৌকো চড়ে, তিস্তা পর্যন্ত। হাঁস মারতে গেছিল কাকা, মনা জেঠুর সঙ্গে। তামাহাটের মিত্তিরদের বাড়িতে এসে উঠতেন মনা জেঠু।

কী সুন্দর স্বচ্ছ জল গঙ্গাধরের। তিস্তার কাছাকাছি গেলে, আরও স্বচ্ছ। এতই স্বচ্ছ যে, জলের নীচের কমলা-গেরুয়া রঙা বালির ওপরে রং-বেরং-এর গোলগোল নুড়ি দেখা যায়। কত রঙ-বেরঙা হাঁস। বড়, ছোট। ছাইরঙা রাজহাঁস। কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক করে উড়ে যায়, মাথার উপর দিয়ে। সেবারে অনেকেই ডিম-সেদ্ধ, পাউরুটি, আর কলকাতার কেক খেয়েছিল, মনে আছে।

দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত তামাহাট খুব বড় বন্দর ছিল। পাট বেচাকেনা হত। পূব পাকিস্তানের পাট-চাষের সব জেলা থেকে বড় বড় মহাজনি নৌকো করে পাট আসত। জায়গাটা খুবই রমরম করত নাকি তখন। তামাহাটের জেঠিমার কাছে শুনেছে সেই সব সুখের, স্বচ্ছলতার দিনের গল্প। হাটের দিনে, গোরুর গাড়ি করে ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার মহাশোল মাছ আসত। মস্ত মস্ত। বড় বড়, লাল-রঙা তাদের আঁশ। পাথালি করে রাখলে, গোরুর গাড়ির শরীর ছাড়িয়ে যেত মাছগুলো। যেমন দেখতে, তেমনই স্বাদ।

ওরাও ছোটবেলায় যে কিছুমাত্র দেখেনি এমন নয়, কিছু কিছু দেখেছে। দিশি ঘোড়ায় চেপে মুনসের মিঞা আসত বাঘডোরা গ্রাম থেকে হাটের দিনে। সাদা চুলের উপরে কালো কাজকরা মুসলমানি টুপি বসান। তামাহাটের হাটের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে শিলির। গুড়, চিনি, খোল, সর্ষের তেল, কেরোসিন তেল, পাট, ধুলো, তামাক পাতা আর গোরু মোষের গন্ধ মিলে এক আশ্চর্য মিশ্র গন্ধ উঠত হাট থেকে। সে গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। সময় চলে যায় ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিতে সেই সব বর্ণোজ্জ্বল শব্দ, দৃশ্য, গন্ধ বড় অবিশ্বাস্যরকম জীবন্ত হয়ে থেকে যায়।

বারো বছর বয়সে শাড়ি ধরিয়ে ছিলেন মা। ও যখন হঠাৎ বড় হয়ে গেল একদিন, সেদিনের সেই ভয়, আনন্দ আর রহস্যের দিনের কথা এখনও মনে পড়ে। মা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েদের অনেকেই বিপদ। এই পৃথিবীর কোনো পুরুষমানুষকেই বিশ্বাস না করতে বলেছিলেন। কাউকেই না। এক নিজের বর ছাড়া, যখন বিয়ে হবে।

শিলি জিগগেস করেছিস, বাবাকে?

না। বাবাকে, কাকাকে, কাউকেই না।

বড় ভয় করেছিল শিলির। এ কেমন বড়-হওয়া যে, বাবাকেও পর করে দেয়? সুন্দর এক আশ্চর্য রস গন্ধ-স্বাদে ভরা পৃথিবী ছিল তার। বাঁশবাগানের আলোছায়ার খেলা ছিল। নদীতে সাঁতার কাটা ছিল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে, যখন ভুটানের পাহাড় দেখা যেত উত্তরের আকাশে; হিমালয়, কখনো কখনো কাঞ্চনজঙ্ঘাও, সোনার মতো ঝলমল করে উঠত সেই পাহাড় শ্রেণির চুড়ো। শরতের মেঘের মধ্যে, আগুন লেগে গেছে বলে মনে হত তখন। দাঁড়িয়ে থাকত, খোলামাঠে তার খেলার সাথী কুমারের হাতে হাত রেখে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

চলে গেল সেই সব দিন। কেমন হঠাৎ। বড় হঠাৎই চলে গেল ছেলেবেলাটুকু। বৃষ্টি মাথায় করে কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ খেলা। তাও চলে গেল।

মেয়েদের শরীর যে মেয়েদের এত বড় শত্রু, তা মোটে বারো বছর বয়সেই জানতে পেরে বড়ই কষ্ট হয়েছিল শিলির। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে নিজেকে অভিশাপও দিয়েছিল বার বার। আশীর্বাদও মনে হয়, মাঝে মাঝে এখন। অবিমিশ্র দুঃখ বা সুখ কোথাওই নেই, তা বুঝে।

এখন, এই ঘেরাটোপের জীবনই অভ্যেস হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে যে, মেয়েরা আলাদা সৃষ্টি বিধাতার। আলাদা জাত। ছোট জাত। পুরুষের কৃপাধন্য তারা।

বাবার জ্বরটা লিখে রেখে দিল স্লেটে।

তারপর বাবাকে বলে চান করতে গেল, ইন্দারার পাড়ে।

ক্যাবলাটার বয়স হবে পনেরো-ষোলো। ও এই সময় থাকে না। একদিন চান করার সময় শিলি হঠাৎই দেখেছিল যে, ইঁদারার পিছন দিকের মানকচুর ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে, ক্যাবলা চান দেখছে, শিলির। ভেজা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছিল ওকে।

বলেছিল, চোখ গেলে দেব। বুজেছিস!

তারপর থেকে ও ভালো হয়ে গেছে। ক্যাবলা বলেই হয়তো হয়েছে। চালাক হলে হত না।

চান করতে করতে শিলি ভাবছিল, ক্যাবলা তার চান করা দেখেছিল বলে তাকে চড় মেরেছিল ও। অথচ এমনও কেউ আছে, যাকে সবকিছুই দেখানোর জন্য সে উন্মুখ। অথচ তারই কোনো সাড়া নেই।

কী আশ্চর্য! কেন যে এমন হয়!

মনে আজকাল ভয়ও হয় শিলির। পুতনের ব্যবহারে। পুতনের বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। শিলির বাইশ। এত বয়সি কুমারী মেয়ে এখন আর এখানে নেই। না, একজনও নয়।

বিয়ে অবশ্য কালই হতে পারে।

গদাইদের অবস্থা ভালো, আলোকঝারি পাহাড়ের নীচে অনেক ধান জমি। কাঠের ব্যাবসা। ধুবড়িতে তার বাবার কয়লার দোকানও আছে। বড় দাদা স্টিমার কোম্পানিতে সাপ্লায়ার। ধুবড়িতে। মেজদাদা ম্যাচ ফ্যাকটরির। গদাই, ছোট ছেলে। চাষ-বাস দেখাশোনা করে। শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। নাক থ্যাবড়া। গা দিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ। নাদু ময়রার গায়ে যেমন ছানাছানা, চিনির শিরাশিরা গন্ধ, তেমনই মাটি-মাটি গন্ধ।

বর হিসেবে ওকে ভাবাই যায় না। কখনোই না। লেখাপড়াও করেছে মাত্র পাঠশালা অবধি। অথচ শিলির বাবার খুবই ইচ্ছে। শুধুমাত্র গদাইদের অবস্থা ভালো বলেই। গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে শিলির। বেঁচে আছে ও শুধুই তার পুতনদারই আশায়, পুতনদারই জন্যে।

আগে, সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি লিখত পুতনদা। ফোটোও পাঠিয়েছিল গতবছরে। সাইকেলে হেলান দিয়ে কালো ডোরা ফুলশার্ট আর প্যান্ট পরে চা-বাগানে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুতনদা। ধবধবে রঙ। মুখটা গোলগাল। কিন্তু খুব মিষ্টি। কত সব খবর দিত সে তখন, প্রত্যেকে চিঠিতে। বারো বছর বয়সে যে-জগৎকে হারিয়েছিল শিলি, পুতনের চিঠির মাধ্যমে সেই জগৎকেই ফিরে পেয়েছিল আবার।

পুতনকে শিলিগুড়িতেও যেতে হত মাঝে মাঝে। অন্য সব বাগানেও বকেয়া পাওনা উশুল করতে যেতে হত।

ও লিখত, আজ বাগরাকোটের সাহেব ম্যানেজার ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জী সাহেব আর তার বউ বেটি

ম্যাকেঞ্জীকে দেখলাম। আহা! দেখে মনে হয় যেন ইংরেজি বায়োস্কোপ দেখছি। কী সুন্দর যে সাহেব মেম! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বেসই হত না।

একদিন লিখল, তিস্তার চ্যাংমারীর চরে নতুন করে চাষের বন্দোবস্ত হচ্ছে। 'রিক্ল্যামেশন' হচ্ছে চর। এই চরের ঘাস পরিষ্কার করে চাষাবাদ হবে ভবিষ্যতে। তিস্তার সব চরেই চা-বাগানের ম্যানেজারেরা বাঘ শিকারে যেতেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি, পুলিশের হাতি সব এসে নাকি জমায়েত হত। উত্তর বাংলার কমিশনার আইভ্যান সুরিটা, ডি-আই-জি রঞ্জিত গুপ্ত, চিফ সেক্রেটারি রণজিৎ রায়, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় আরও কত সব লোকের কথা লিখত পুতনদা। লিখত, জলপাইগুড়ির রানির কথা। রানি অশ্রুমতী দেবী—রায়কতদের রানি। তাঁর একমাত্র মেয়ে, রাজকুমারী প্রতিভা দেবী। তাঁর সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর দাদা ডাক্তার কিরণ বসুর। জ্যোতি বসুর ডাকনাম যে গণা, তাও পুতনদার চিঠিতেই ও তখন জানতে পারে।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে এক জোড়া সাপ ছিল, বিখ্যাত। সে সাপেরা ছিল বাস্তুসাপ। কারোকে কিছু বলত না নাকি!

পুতনদা বছরখানেক হল চিঠি দেওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। মাসে একটা লিখত ছমাস আগে। তারপর দু'মাসে একটা।

শেষ চিঠি পেয়েছে ছমাস আগে। এবারে হয়তো বছরে একটা লিখবে। তারপরে থেমে যাবে চিঠি আসা, একেবারেই।

মাসিমা কিরণশশীর কাছে শুনেছে শিলি যে, পুতনদার কুমারগঞ্জে আসার আর দেরি নেই। সঙ্গে করে নাকি বাগানের ম্যানেজারের কাছে বেড়াতে আসা ম্যানেজারের শালার ছেলেকে নিয়ে আসছে। কলকাতার ছেলে। গ্রাম নাকি দেখেনি সে আগে। তাইই আসছে পুতনদার সঙ্গে। ছেলেটি নাকি পুতনদারই সমবয়সি, যেমন লিখেছে মাসিমাকে, পুতনদা। ভালো কাজ করে নাকি কোনো বিলিতি কোম্পানিতে। ভালো মানে, উঁচুদরের কেরানি। পুতনদা নাকি দুঃখ করে লিখেছে, ম্যানেজারের শালার ছেলে মানে, ম্যানেজারই। তাকে খাতির যত্ন করে খুশি রাখতেই এবারের ছুটিটা কেটে যাবে। যদি না সে আগেই ফিরে যেতে চায় কুমারগঞ্জ থেকে। তার চাকরিটা শখের। অঢেল পয়সা। বনেদি পরিবার।

তবে শিলিকে লেখেনি কিছুই। যা লেখার তা সবই মাসিমাকেই লিখেছে। তাই খুবই অভিমান হয়েছে শিলির। ভয়ও যে হয়নি, তাও নয়। নানারকম ভয়েই বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে ও, ক'দিন হল। সবসময়ই বুক দুরদুর করে।

চা-বাগানে কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হল পুতনদার? একটা চা বাগানে নিশ্চয়ই অনেক বাঙালি কর্মচারী থাকেন। বিশেষ করে, বাগানের মালিক যখন বাঙালিই। তাঁদের সব বাড়িতে কি শিলির চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো একটিও মেয়ে নেই? না থাকলেও, তাদের কত শালি-টালিরাও আসতে পারেন তো বেড়াতে। কে জানে, কী হল? কেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেল পুতনদা?

খুবই রাগ হয় শিলির, সেই সব অদেখা মেয়েদের উপরে। তাদের তো কতই আছে বাছাবাছির। শিলি যে ইন্দারার ব্যাং। ওর যে পুতনদা ছাড়া আর কেউই নেই এই জগতে। সেই শিশুকালের সাথী। সুখদুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছে দুজনে। একসঙ্গে। একই ধরনের বোঝাবুঝি, সমঝোতাও গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এই পুতনদা যে তার মনের আদর্শ পুরুষ, তা আদৌ নয়। তবে, পুতনদা ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও তার আসেনি। বাছাবাছির সুযোগ না থাকাতে, যা হাতের কাছে থাকে, তাকেই ভালো লাগাতে হয়। দেখতে দেখতে, একসময় ভালো

লেগেই যায়। বার বার মনোযোগ দিয়ে কোনো গাছের দিকে তাকালেও তাকে ভালোবেসে ফেলে মানুষ; মানুষকে তো বাসতেই পারে। বাসেই!

"আদর্শ" পুরুষ বলতে সে নিজে যা বোঝে তেমন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে কোনোদিনও হবে না। কোনো মেয়েরই জীবনের আদর্শ পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে কখনোই হয় না তার, আর যা-কিছুই হোক-না-কেন। হয়তো, না হওয়াই ভালো। এক ঘরের মধ্যে খুবই কাছাকাছি থেকে, দিনের পর দিন দেখলে, সব আদর্শেরই রঙ চটে যায়। জেল্লা ম্যাটম্যাট করে। "আদর্শ" ব্যাপারটার মধ্যেই বোধহয় দূরত্বের আর যাত্রার গন্ধ আছে একটু। ওসব দূরে রাখাই ভালো। শিলির "আদর্শ" পুরুষের কাছাকাছি মাত্র একজনকেই দেখেছিল সে, তামাহাটে।

মিত্তিরদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সেই ছেলেটি, কলকাতা থেকে। মাসখানেকের জন্যে। সেখানেই দেখা হত। সে বাড়িতে দেখা হত, যখন শিলি যেত তামাহাটে। আবার সাইকেল নিয়ে সেও এই কুমারগঞ্জে চলে আসত, তামাহাট থেকে। শিলি ভেবেই আনন্দ পেত যে, সে আসত, হয়তো শিলিকে শুধু একবার দেখতেই। হয়তো সত্যিই তাই আসত। কলকাতার কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ত সে। কলেজের নামটা ভুলে গেছে শিলি।

ছেলেটির গায়ের রঙ ছিল মাজা। কিন্তু খুব লম্বা। মাথা-ভরতি চুল, সুন্দর, শক্ত চেহারা। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরত, নয়তো হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। তাও সাদা। ছেলেটির মধ্যে শুধু শিক্ষাই ছিল না, সহবৎ, সম্ভ্রান্ততা সবই ছিল। "বড়ঘরের ছেলে" বলতে শিলির মা চিরদিন যা বোঝাতেন, তার সবই ছিল সেই হিতেন বোস-এর মধ্যে। শিলির জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা হত তাই "হিতুকাকু" বলে সম্বোধন করত শিলি তাকে। একটা পুরো মাস, বর্ষায় চ্যাগারের পাশের গাছের গন্ধরাজ ফুলের গন্ধরই মতো তাকে আমোদিত, আনন্দিত, শিহরিত করে রেখে, হিতেন ফিরে গেছিল কলকাতায়।

যখন ছিল এখানে, তখন আলোকঝারি পাহাড়ে শিলি তার সঙ্গে সাত-বোশেখির মেলায় গেছিল। শিকারের শখও ছিল ছেলেটির। ধুবড়ির পূর্ণবাবুর দোনলা বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছিল সে। শিলির "মারকুইট্টা" কাকার সঙ্গে, পর্বতজুয়ারে চিতাবাঘ আর শুয়োরের খোঁজে যেত হিতেন। ওসব একদিনও পায়নি। ফিরে আসত প্রায়ই সোনালি বনমোরগ সাইকেলে বেঁধে। অবশ্য লালচে কুটরা হরিণ মেরেছিল একদিন। কাকা আর হিতুকাকু দুজনে মিলে কষ্টে-সৃষ্টে টুঙ বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে এনেছিল কুটরা হরিণটাকে।

রক্তারক্তি, মারামারি শিলি যে পছন্দ করে না, একথা বলার পরদিন থেকেই "হিতুকাকু" বলেছিল, 'যে-ক'দিন এখানে আছি শিলি, আর কিছুই শিকার করব না; হিংস্র কিছু ছাড়া।'

হিংস্র কিছু মানে? কী কী?

বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বিষাক্ত সাপ, আর এই ধরো তোমার মতন সুন্দরী মিষ্টি-হাসির কোনো মেয়ে!

আহা!

বলেছিল, শিলি।

লজ্জাতে শিলির গাল লাল হয়ে গেছিল।

তারপরে হিতুকাকু চলে গেলে, দেওয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল শিলি এসে। পড়ন্ত বেলার নরম কমলা রোদ, কালোজাম গাছের পাতার ঝালরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছিল। ঘরময়। শিলির চুলে, মুখে। কমলার সঙ্গে বেগুনি আভা মিশে গেছিল যেন সেই আলোয়।

কালোজামেব পাতারাও কি বেগুনি হয়? আলোমাখা কালোজামের পাতাদের দিকে চেয়ে ভেবেছিল ও।

কী বা আছে তার? ভেবেছিল, শিলি। জোড়া ভুরু, কুচকুচে কালো রঙ। নাকটি অবশ্য বেশ টিকালো, চোখ দুটি বড় বড়। বড় বড় চোখের পাতা আর পল্লব। দাঁতগুলোও খুব একটা খারাপ নয়। মন্দ কী?

নিজেকেই নিজে বলেছিল শিলি!

শিলির মা বলতেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড় প্রসাধন হচ্ছে দুটি। একটি হল যৌবন। অন্যটি বুদ্ধি। যৌবন চলে গেলে, যতই সাজো লাভ নেই। যৌবনের দীপ্তিটাই আলাদা। আর বুদ্ধি না থাকলে, গায়ের ধবধবে রঙ, স্নো, পাউডার, রুজ কিছুতেই তার অভাব ঢাকা পড়ে না। প্রত্যেক মেয়েকেই যৌবন এক আলাদা শ্রী দেয়, দীপ্তি দেয়। যৌবনে কুকুরীকেও সুন্দরী দেখায়।

কে জানে! হিতুকাকু কী দেখেছিল তার মধ্যে!

অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই গেঁয়ো শিলির দু চোখে তাকিয়ে থাকত। অসভ্যর মতন নয়। দারুণ এক দৃষ্টিতে, বোধহয় কবি-টবিরা এমন চোখে তাকান, যাঁদের নিয়ে তাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের দিকে। গা শিরশির করে উঠত শিলির। হিতুকাকুর সেই চাউনি যেন তার আপাদমস্তক লেহন করত কিন্তু তাতে কোনো অশালীনতা ছিল না, নোংরামি ছিল না। হিতুকাকু মানুষটার মধ্যে কোনোরকম নোংরামিই দেখেনি শিলি। এমন পুরুষ জীবনে কমই দেখেছে।

চলে যাবার সময় শিলির একটা ফোটো চেয়েছিল হিতুকাকু। সম্প্রতি তোলা ফোটো নেই শুনে, তামাহাটের পিন্টুদাদের বাড়ি থেকে ক্যামেরা ধার করে এনে, আদর করে শিলির ফোটো তুলেছিল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাকে সেই ফোটো আর একটি সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছিল হিতুকাকু। এমন সুন্দর কাগজে, এমন সুন্দর ভাষায়, অমন নরম, ভদ্র ভালোবাসার চিঠি যে কেউ লিখতে পারে তা ওই চিঠি না পেলে জানতেও পেত না। একটি চিঠি যে রুখু মনের মধ্যেও সব ফুলগুলি কী ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা হিতুকাকুর চিঠি না পেলে সত্যিই জানত না কখনো শিলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিলি, ঘাড়ে আর পিঠে সাবান মাখতে মাখতে, চান করতে করতে।

মা চলে যাবার পর, এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো মেয়ে নেই বলে, কতদিন যে পিঠে ভালোকরে সাবান দিতে পারে না। একদিন ও-বাড়িতে গিয়ে হোন্দলের মাকে দিয়ে পিঠ ঘষাবে ঠিক করল।

হিতুকাকু এখন বম্বেতে বড় চাকরি করে নাকি। বিয়েও করেছে গতবছর। ছেলেমেয়ে নাকি হয়নি এখনও। হিতুকাকুর বউ-এর ছবি দেখতে খুব ইচ্ছে করে, শিলির। সে কি শিলির চেয়েও সুন্দরী? শুনেছে, খুবই সুন্দরী। শহরের সুন্দরী। বি. এ. পাস। মোটর গাড়ি দিয়েছে নাকি মেয়ের বাবা হিতুকাকুকে, বিয়েতে। ছেলেগুলো বড় বোকা হয়। শিলিরও দেবার অনেক কিছুই ছিল। বিয়ে করলে, তবেই না জানতে পেত হিতুকাকু। সেই শহুরে মেয়ে কি তার মতো খেজুরে গুড়ের পায়েস রাঁধতে পারে? নতুন চালের পাগল-করা গন্ধের ফেনাভাত? বড় বড় কইমাছের হর-গৌরী? একপাশে—মিষ্টি, একপাশে—ঝাল? হিতুকাকুর বউ, বড় চিতল মাছের তেলওয়ালা পেটি কি রান্না করতে পারে শিলির মতো। কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে ধনেপাতা দিয়ে? চিতলের মুইঠ্যা? মাঝারি শিঙ্গি মাছ দিয়ে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা-বেগুন আর পেঁয়াজ দিয়ে গা-মাখা চচ্চরি? ঝাল-ঝাল, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ? গঙ্গাধর নদী ডুব সাঁতারে এপার ওপার করতে পারে কি সেই বড়লোকের মেয়ে? গাছ-কোমর করে শাড়ি পরে, সিঁদুরে-আমের গাছের মগডালে চড়ে আম পেড়ে খাওয়াতে পারে হিতুকাকুকে। চটের উপর রঙিন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধর নতুন পাট দিয়ে লিখতে পারে কি GOD IS GOOD অথবা DO NOT FORGET ME? সে কি বিশ্বাস করে মনে প্রাণে যে, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে"? শিলিরও দেবার অনেক কিছুই ছিল। সব দানের কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু ছিল যে, তা শিলিই জানে। অনেক এবং অনেকরকম দান।

গা মাথা মুছে ফেলল শিলি। বাবার বার্লিটা জ্বাল দিতে হবে। পিউরিটি বার্লি ছাড়া অন্য বার্লি আবার বাবার মুখে রোচে না। মা খেতে ভালোবাসতেন হাণ্টলি-পামারের বিস্কিট। দু একবারই খেয়েছিলেন অবশ্য। বাবা কাকে দিয়ে যেন আনিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে।

এসব ভেবে আর কী হবে? চলে-যাওয়া দিনের কথা। দূরে-থাকা "আদর্শ" পুরুষের কথা ভেবে?

তবু, ভাবনা তো শুধু মানুষেরই বিশেষ গুণ। ভগবানের বিশেষ দান। ভাবতে, সব জীবই তো আর পারে না।

ম্যানেজারবাবুর বাংলোর বারান্দার সাদা রঙ-করা বেতের চেয়ারে বসে, কাচের টেবিলের উপরে রাখা, সুন্দর দেখতে, বম্বের পেডার পটারির টি-পট্ থেকে ঢেলে চা দিচ্ছিল পুতনকে, ম্যানেজারবাবুর মেয়ে রুচি।

দার্জিলিং-এর লরেটো কলেজে পড়ে সে। কথায় কথায় কাঁধ-ঝাঁকিয়ে, ববকাট চুল উড়িয়ে, ইংরিজি বলে।

ঘোর লেগে যায় পুতনের। এ এক নতুন জগৎ!

উলটো দিকের চেয়ারে পুতন এবং রুচির কলকাতা থেকে আসা কাজিন, রাজেশ বসে আছে।

কুমারগঞ্জ গ্রামের অতি সাধারণ অবস্থার ছেলে পুতন প্রথম প্রথম এমন পরিবেশে কুঁকড়েই থাকত। কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারত না। আর বাঙালত্ব নিয়ে বাগানের অনেকে তো বটেই এবং খাস কলকাতার "ঘটি" মানুষ ম্যানেজারবাবুও বেশ একটু ঠাট্টা-তামাশাও করতেন।

বাগানের মালিক এখন আর বাঙালি নেই। মাত্র তিনমাস আগে মারোয়াড়িকে বিক্রি করে দিয়েছেন আগের মালিক। সেই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ব্যাবসাও কলকাতাতেই। আগের মালিক কলকাতার বাঙালি ছিলেন বলেই কুলি-কামিনরা ছাড়া কলকাতার লোকই বেশি, এই বাগানে।

প্রথম প্রথম গেলুম, খেলুম, নুন, নংকা, নুচি, নেবু, এই সব শুনে ভিমরি খেত পুতন। কিন্তু বেশিদিন পতিত থাকার চরিত্র নিয়ে পুতন জন্মায়নি। কিছু মানুষ, পাটিগণিতের বইয়ের তৈলাক্ত বাঁশে-চড়া বাঁদরের মতো প্রচণ্ড অধ্যবসায় নিয়েই জন্মায়। পুতন, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শ্রেণিতে পড়ে। যেহেতু ম্যানেজার এবং বাগানের অধিকাংশ অফিসার কলকাতার লোক, পুতন অচিরে শুধু তার বাঙালত্বই যে বিসর্জন দিয়েছে তাইই নয়, তাদের সঙ্গে সমানে করলুম খেলুম, মলুম, শুলুমও করে যাচ্ছে। শেয়াল যেমন হালুম হুলুম ডাক ছাড়তে পেরে কখনো সখনো শ্লাঘা বোধ করে যে, সে বাঘ হয়েছে; পুতনও তেমন খেলুম, শুলুম, নুন, নংকা, নুচি বলে বলে তার অকারণের হীনমন্যতাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, খাস কলকাতার লোক হয়েছে ভাবতে লাগল।

এদিকে খাস-কলকাতার লোকেরাও যে, আজকাল হুম হুম ছেড়ে, "খেয়েছিলাম"-এ ফিরে আসছেন "গেসলুম' ছেড়ে "গেছিলাম"-এ সেটা নকল করার মতো বিদ্যে বুদ্ধি পুতনের ছিল না। অনুকরণের বিদ্যে অনেক সহজ, ওরিজিনালিটির শিক্ষা তা নয়। প্রোটোটাইপ সহজে হওয়া যায়, ওরিজিনাল ওরিজিনাল হতে পারেন। তাকে নিয়ে খাস কলকাতার লোক এবং খাস পূর্ব-বাংলার মানুষেরা সকলেই যে একইসঙ্গে সমানে হাসাহাসি করে সে কথা বোঝার মতন বুদ্ধি পুতনের ছিল না। বুদ্ধি পুতনের কোনোদিনই বিশেষ ছিল না। অধিকাংশ মানুষই দুর্বুদ্ধি আর সুবুদ্ধির মধ্যে যে তফাত আছে, তা কোনোদিনও নিজেরা পুরোপুরি বোঝে না। তাদের জাগতিক উন্নতির জন্যে, যে-কোনো ফলপ্রসূ বুদ্ধিকেই তারা সুবুদ্ধি বলে মনে করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুতন সেই গরিষ্ঠদের, জনগণের দলে।

রুচির পোশাক-আশাক, জামা-কাপড়, হাসি, সবই ঘোর লাগায় পুতনের মনে। তবে ও বোঝে

যে, রুচির দিকে হাত বাড়ালে তার হাতটাই যাবে কাটা। তাছাড়া মালিকানা বদলের পর ম্যানেজারবাবুর মাথাটাও যে ধড়ের উপরে বেশিদিন হয়তো নাও থাকতে পারে, এ জ্ঞানটাও পুতনের ছিল না। এই সময়ই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রুচির এক মামাতো বোনও এসেছে এখানে বেড়াতে। ওদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। মেয়েটির মাজা রঙ, গালে একটি কাটা দাগ। গ্রামের মেয়ে হলেও বুদ্ধি যে সে রাখে তীক্ষ্ণ, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার পোশাক-আশাক এবং আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় যে, তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, এবং রুচিদের কৃপাপ্রার্থী তারা। সবসময়েই সে এই পরিবারের মন যুগিয়ে চলে। নানা ব্যাপারেই পুতন, রুচির সঙ্গে সেই মেয়েটির এই তারতম্য লক্ষ্য করে। খাওয়ার সময়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ম্যানেজারবাবু এবং রুচি এবং রুচির ছোটমামা রাজেন এমনকি রুচির মা এবং ছোট ভাইও একই সঙ্গে খেতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করত সেই মেয়েটিই। অলকা তার নাম।

রুচির মা একদিন বলেছিলেন, অলকাকেই : অলি আমাদের খুবই কাজের মেয়ে। এই ক'দিন একটু যত্ন-আত্তি করত মা আমাদের।

অলি খেতে বসত, বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়ার পর বাবুর্চিখানার মেঝেতে। কোনোদিন বা একটা টুলের উপর বসে, কোলের উপরে অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে সে খেত। প্রায় বাবুর্চি-বেয়ারাদের মতো। লক্ষ্য করেছিল পুতন। অন্যরা খাওয়াদাওয়ার পর খাটে শুয়ে বা চওড়া বারান্দায় বসে যখন নভেল পড়তেন বা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতেন অথবা ছায়াচ্ছন্ন পাখিডাকা বাগানে দোলনা চড়তেন, তখন অলি আচার আর পাঁপড় বানিয়ে উবু হয়ে বসে, ঘুরে ঘুরে শুকোতে দিত বাগানেরই এক কোণায়।

অলিকে দেখে পুতনের দুটো জিনিস মনে হত। প্রথমত, অনেকই দিক দিয়ে অলকা পুতনের শ্রেণির। যদিও অমিলও ছিল অনেক। তাকে বিয়ে করতে যদি পারে পুতন, তাহলে পুতন এক নতুন জাতে উঠবে। এই চা-বাগানে "বাঙাল" বলে তার যে হেনস্থা, তা ঘুচবে।

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়াকে বিয়ে করায় তার উন্নতি অনিবার্য। গরিব আত্মীয়দের সচরাচর বড়লোকেরা এড়িয়েই চলেন। কিন্তু যে-আত্মীয় চোখের সামনে জলজ্যান্ত থাকে তাকে একটু মর্যাদা নিজেদের খাতিরেই দিতে হয়। অন্য কিছু না হলেও, লোকভয়েরই কারণে। তাছাড়া, প্রায় মরে-যাওয়া বিবেকও হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে মৃগী রোগীর মতো খিঁচুনি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে বলেও।

শিলির কথাও মনে যে পড়ে না পুতনের তা নয়। কিন্তু তাকে সে বিয়ে আদৌ করবে না। করা সম্ভব নয়। বিয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, প্র্যাকটিকাল পুরুষও নারীর সমস্তটুকু ভবিষ্যৎ জড়িত। যে মূর্খরা একথা না বোঝে তাদের কপালে দুঃখ অবধারিত। এবং তা খণ্ডাতে পারে, এমন কেউই নেই। স্বয়ং ভগবানও না।

অনেকই ভেবে দেখেছে পুতন। শিলিকে বিয়ে করলে, শিলির বাবার দায়িত্বও পুতনকে নিতে হবে। তার নিজের মায়ের দায়িত্ব তো আছেই তার উপরে।

রুচির ছোট মামা রাজেন ছেলেটা যদিও তার সমবয়সি, কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের। পুতনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতেই এবং ওকে একা পেতেই বার-বার বলেছে, কী গুরু! চা বাগানে এলুম, দুটি-পাতা একটি কুঁড়ির জায়গাতে দু একটি কুঁড়ি-ফুঁড়ি একটু দেখাও। কুঁড়ি ফুটিয়ে ফুল করি। যেমন শুকনো পাতা ফুটিয়ে চা করি। নানারকম আদিবাসী কামিন-টামিন...

প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি গাঁয়ের সরল ছেলে পুতন, কথাটা। কারণ পুতনের ওসব দিকে কোনো উৎসাহই ছিল না। কুলি-লাইনের কোন কোন ঘরে কেমন মেয়ে আছে এবং কোন কোন কামিনেরা পয়সার বিনিময়ে দেহ দেয়, তা সে জানত না। জানার কোনো ঔৎসুক্যও ছিল না। তবে,

কেউ কেউ যে দেয়, তা সে অফিসের বাবুদের কানাঘুষোয় শুনতে পেত।

ম্যানেজারবাবুর বাড়িতেই একটি মেয়ে কাজ করে? সে মেয়েটি নাকি ম্যানেজারবাবুরই রক্ষিতা। দারুণ দেখতে কিন্তু মেয়েটি। বছর কুড়ি বয়স হবে। কাটা-কাটা চোখমুখ, তেমনই শরীর, বেশ লম্বা, কোমর অবধি চুল।

ম্যানেজার সাহেবের বউ, বর্ষার সময় যখন কলকাতায় যান বাপের বাড়ি, একেবারে পুজো কাটিয়ে আসবেন বলে, তখন এই মেয়েটিই নাকি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী হয় রাতে।

পুতন অবশ্য সহজেই বাগানের অন্য কারও সাহায্যে কলকাতার রাজেনবাবুর জন্যে বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু তাহলে রাজেন যে তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যের খপ্পরে গিয়ে পড়ত। রাজেনকে হাতছাড়া করে এমন বোকা পুতন নয়। রাজেনই এখন ম্যানেজারবাবুর বাড়ির সঙ্গে পুতনের একমাত্র সেতু। সেতু ভেঙে যাক, তা সে চায় না।

কী ভেবে, পুতন হঠাৎ একদিন রাজেনকে আশ্বস্ত করে বলেই ফেলল যে, আজকাল নানারকম প্রবলেম বাগানে। পলিটিকাল পার্টি-ফার্টি আছে। তিলকে তাল করে এরা। কামিনদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আগেকার দিনের মতন কোনো শালার জোতদারি নয় তারা। তাছাড়া, কোনোরকমে জানাজানি হলে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত বিপদে পড়বেন। সবচেয়ে আগে চাকরিটা যাবে তাঁরই। এখানে কিছু হবে না। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে, আমাদের দেশের বাড়িতেই বরং। আমার হাতেই আছে একটি। আমি যা বলব, তাইই সে করবে। আ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু টু, ইন দ্যা বুশ।

জিনিস কেমন?

রাজেন ভুরু তুলে, সিগারেটে টান দিয়ে, লাল-লাল চোখ নাচিয়ে বলেছিল।

কেমন আর! গেঁয়ো জিনিস যেমন হয়। তেমন আর কী। তবে...ভালো।

আনটাচড তো?

এক্কেবারে। সেটুকু বলতে পারি। গ্যারান্টি।

গুরু, তুমি নিজে? নিজেও কি দু একটি পাঁপড়ি ছেঁড়োনি?

ছিঃ?

বলেছিল, পুতন। হঠাৎ-বিবেকের কামড় খেয়ে। বিবেক হচ্ছে, বিছের মতন জিনিস। কোথায় যে কোন চিপুতে লুকিয়ে থাকে, আর কখন যে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কামড় দেয় মানুষকে, তা যারা বিবেক অথবা বিছে এ দুয়ের একটিকেও জানে; তারাই জানে!

পুতনের দুকান গরম, লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

এ কথা ঠিক যে, পুতন ছেলেটার স্বচ্ছল জীবনের প্রতি বড় লোভ। শিশুকাল থেকে অর্থাভাবের জন্য বহুরকম কষ্ট ও অসম্মানকে সে জেনেছিল। তবু এখনও তেমন অন্যায় কিছু করেনি সেই লোভের বশবর্তী হয়ে। "খারাপ" হয়নি এখনও। জানে না, কোনোদিনও "খারাপ" হবে কী না। তবে খারাপ হতেও যে, ভালো হওয়ার চেয়ে কম কষ্ট হয় না; এই খারাপ কথাটা রাজেনকে বলে ফেলেই ও বুঝতে পারল। বুঝল পুতন, বি-কম-এ ফারস্ট-ক্লাস পাওয়াটা যেমন কষ্টের, শিলিকে তার নিজের উন্নতির জন্যে রাজেনের ভোগে লাগতে দেওয়াও তার চেয়েও অনেকই বেশি কষ্টের। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বড় কষ্টের। যে, যেমন করেই বাঁচুক না কেন!

পুতনের ছিঃ শুনেই, খুব জোরে হেসে উঠেছিল রাজেন।

তারপর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল মা-ন্-তু!

আমি ওসব লাইনেই নেই।

পুতন বলেছিল। রেগে।

আবারও বলেছিল, রাজেন।

মা-ন্-তু!

বলে, আবারও পুতনের থুতনি নেড়ে দিয়েছিল জোরে। বলেছিল, নেকুপুষুমুনু আমার।

পুতন মোটেই দুশ্চরিত্র নয়। কখনোই কোনো মেয়ের সঙ্গে ও কিছুমাত্রই করেনি। গতবার যখন দেশে গেছিল, তখন এক দুপুরবেলায় শিলিকে আমবাগানের ছায়ায় একটা চুমু খেয়েছিল শুধু। তাও, জোর করে, ওকে গাছে চেপে ধরে। উ-উ-উ-উমম করে আপত্তি জানিয়েছিল শিলি। কিন্তু পুতন বুঝেছিল যে, ভালো লেগেছিল শিলির। কোনো মেয়েকে আদর করতে গায়ের জোরের চেয়ে ভালোবাসাই যে অনেক বেশি লাগে, তা সেই দুপুরেই প্রথম জেনেছিল ও। উত্তেজনা, পুতনেরও কম হয়নি। সমস্ত শরীরে কত যে নাম-না-জানা অনুভূতি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল ঝড়ের দোলালাগা ফুলেরই মতন, তা কী বলবে। নারী শরীরের ওই অদেখা অজানা অসীম রহস্যের আভাস পেয়েই উত্তেজনায় কেঁপেছিল। ভেবেছিল, একটি চুমুতেই যদি এতো উত্তেজনা, তবে আরও বেশি কিছু হলে হয়তো উত্তেজনাতে মরেই যাবে। ভালো লাগাটা এতই বেশি ভালো যে, খারাপ লেগেছিল ওর। ভেবেছিল পুতন, সমস্ত ভালো জিনিসই, অথবা নেশার জিনিসই, প্রথম প্রথম বোধ হয় খারাপ লাগে। মদেরই মতো।

চাকরিতে উন্নতি করতে হলে, একটু মদ-টদও নাকি খেতেই হয়। ম্যানেজারবাবু নিজেই বলেছিলেন একদিন।

বাগানের মালিক যদিও মারোয়াড়ি, তাঁর শখের অভাব নেই। সবরকম সাহেবিয়ানাতেই তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরিজি উচ্চারণটা যদিও পুতনের চেয়েও খারাপ। তাতে কী এসে যায়? মালিকেরা খোদার সৃষ্ট অন্য গ্রহের জীব। তাঁদের কোনো গুণাহ্ নেই। তাঁরা যাই করুন না কেন, বেহেস্ত-এর দরজা তাঁদের জন্যে সবসময়ই খোলা। মালিকের কাজ করতে হলে, উন্নতি করতে হলে, মালিকের "গু"কেও "সুগন্ধি" বলতে হবে।

লোকে বলে, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে মালিকের বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজারবাবুর বাংলোর ওই মেয়েটিকে ডিরেকটরস্ বাংলোতে ডিউটিতে যেতে হয়, মালিক এলেই।

ব্যাবসাদার মারোয়াড়িরা শুধু কাজ আর টাকা-পাগলা বলেই জানত এতদিন পুতন। এমন "গুণী" মারোয়াড়ির কথা সে আগে শোনে নি। আজকাল নাকি গুণীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, বিশেষ করে কম-বয়সিদের মধ্যে। একথাও শুনতে পায় অনেকেরই কাছে।

পুতন ঠিক করেছে শিলিকে ও তুলে দেবে রাজেনেরই হাতে। একদিনের জন্যে বই তো নয়, তুলে দেবে হুলো বেড়ালের মতন কলকাতার রাজেনের মুখে; অনভিজ্ঞ, বিন্দুমাত্র সন্দেহহীন শিলিকে, কালো, নরম কবুতরীর মতো। কালো কবুতরীরও ভিতরের দিকে তো সাদা পালক থাকেই। নরম, মসৃণ সেই সব পালক রাজেন ছিন্নভিন্ন করবে, এ কথা কল্পনা করেই পুতনের মনেই একধরনের তীব্র বিকৃত আনন্দ হচ্ছিল।

শিলির বাবা নরেশবাবু যদি জানতে পারেন? জানলেও কী? কিন্তু পরেশকাকু? সে জানলে, কী করবে কিছুই ঠিক নেই। অ্যালফাম্যাক্স এল.জি. দিয়ে, ধুনে দেবে হয়তো পুতন আর রাজেনকে। নরেশকাকু করতে পারে না, এমন কাজ নেই। ভালো কাজ। আর সঙ্গে আবু ছাত্তার থাকলে ত কথাই নেই। সোনায় সোহাগা।

রাজেন অবশ্য পুতনকে বলেছে, চিন্তার কিছু নেই গুরু; পেট করে দেবো না। অমন কাঁচা মাল আমি নই। সোনাগাছির রেগুলার খদ্দের আমি। তাইতো মাঝে মাঝে তামাগাছি, রুপোগাছি, পেতলগাছি, দেখতে একটু ভালো লাগে। আমার সঙ্গে কনট্রাসেপটিভ থাকে সবসময়ই। ডাক্তারের

ব্যাগে, যেমন রুগির জন্যে কোরামিন ইনজেকশান্ থাকে। কখন কোথায় যে দরকার হয়, কে বলতে পারে? বলো, গুরু? সব সময় প্রিপেয়ার্ড থাকতে হয়। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন"। কে বলেছেলো জান কি?

কে?

নাই বা জানলে।

সীতার বাপের নাম জান কি?

পুতন চুপ করে থাকল। মানা করা সত্ত্বেও রাজেন কোয়ার্টারে বসে বেশি মাল খেয়ে ফেলেছে। ওটার নাম "ভুটান অরেঞ্জ"। ভুটানি হুইস্কি। এসব কি আলু-পোস্ত খাওয়া উত্তর কলকাতার শৌখিন লিভারে নেয়? ঠেলাটা বোঝো এবার। ভুটান-অরেঞ্জ এসেছে ফুন্টসোলিং থেকে।

পুতন ভাবে, এ সব গর্ভ-টর্ভর ঝামেলা না হলেই হল। "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা।" রাজেন তাকে একদিনে অনেকই শিখিয়েছে। রোজ সন্ধেবেলা মংলুকে দিয়ে দিশি মদ আনিয়ে খাচ্ছে পুতনের কোয়ার্টারে বসে, দুজনে।

আজকের ভুটান অরেঞ্জই গোলটা বাধাল।

সিগারেটে বড় বড় টান দিতে দিতে রাজেন বলেছিল, ছাড় তো গুরু। ছাড়, ছাড়! আমার হাতে নতুন পাখি পড়লে এমন বুলি শেখাব না, যে বাকি জীবন শুধু এ ছাদ ও ছাদ, ও ডাল সে ডাল করে উড়ে বেড়াবে, খুঁটে খাবে। সে পাখি আর কোনো ছা-পোষা কেরানির ঘরে পোষই মানবে না।

খারাপ যে লাগে, তাও নয়। যদিও এক নিষিদ্ধ, অনাঘ্রাত, অদেখা অজানা জগৎ তার চোখের সামনে দিয়ে শীতের দুপুরের মন্থরগতি দারাজ সাপের মতোই যেন ধীরে ধীরে চলে যায়, জলপাই গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

পুতন, ম্যানেজারবাবুর বাংলো থেকে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিল এত সব কথা। বাগানের চা-গাছে ছায়া-দেওয়া, বড় বড় রেইনট্রির মতন গাছগুলোর ছায়া নেমেছে, ঘন হয়ে। কী নাম গাছগুলোর? কে জানে! দূরে, তিস্তার ফিকে-গেরুয়া চর দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে তরাই-এর জঙ্গলের রোমশ বাইসনদের প্রকাণ্ড এক দলের মতো হিমালয় পর্বতশ্রেণি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে। বেলা পড়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দুটি বড় ধনেশ হাওয়ায় ডানা-ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যের দিকে চলেছে, নিষ্কম্প। গ্লাইডিং করে।

ভালো যেমন লাগে, আবার মনটা খারাপও যে লাগে না, তাও নয়।

শিলি মেয়েটা পুতনকে সত্যিই ভালোবাসত। সবচেয়ে বড় কথা, পুতনের মা কিরণশশী, শিলিকে খুবই ভালোবাসেন। মায়ের খুবই ইচ্ছে যে, সে বিয়ে করে শিলিকে।

কিন্তু মা কি জানেন? কী জানেন মা? কতটুকু জানেন এই পৃথিবীর? এই ব্যাবসার জগতের ক্রিয়াকাণ্ডর? উন্নতির সিঁড়ির কথা?

তাছাড়া, মা আর কতদিনই বা বাঁচবেন? অলকাকে বিয়ে করলে ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়া সে, তাকে নিয়ে গিয়ে কুমারগঞ্জ-এর ভাঙা বাড়িতে রাখা যে আদৌ যায় না, এ-কথা মাকে সহজেই বোঝানো যাবে। কানাঘুষো শুনছে এখানে যে, আরও একটি বাগান নাকি নিচ্ছেন ওদের মালিক, ভুটানের বর্ডারে। মালিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মানে, তাদেরও সমৃদ্ধি। এসব কথা জেনে, মালিকের কুৎসিত, বদমাইস-বদমাইস মুখখানিকেও বড় সুন্দর, অপাপবিদ্ধ বলে মনে হয় তার দু-চোখে।

সংসারে টাকার মতো সুগন্ধি, এমন সুন্দর মুখোশ আর কিছুই নেই বোধহয়!

নতুন বাগান নেওয়া হলে, পুতনকে নাকি সেই বাগানে প্রমোশন দিয়ে পাঠানো হবে। বেশি মাইনে, ভালো কোয়ার্টার, স্কুটার।

একটা জিনিসই শুধু খারাপ। বুনো হাতির বড় অত্যাচারের কথা শোনে ভুটানের কাছে। তা, পয়সা রোজগার করতে হলেই মালিকের লাথির মতো হাতির লাথিও খেতে হবে বই কী। শিলিকেও তুলে দিতে হবে রাজেনের হাতে। বিড়ালকে কবুতর সাপ্লাই করতে হবে। পয়সা রোজগার আর অর্ডার-সাপ্লাই ব্যাপারগুলো একেবারেই জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। পুতনের নিজের চরিত্রটা অবশ্য ফারস্ট-ক্লাস। অকলঙ্ক সে। থাকবেও তা।

পুতন বোঝে যে, সে বদলে গেছে। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে কাশফুলের গন্ধে নাক আর ঘুঘুর ডাকে কান ভরে নিয়ে যে সরল, অল্পে-সন্তুষ্ট, সৎ, গ্রাম্য ছেলেটি একদিন কলকাতা গেছিল, সে আর বেঁচে নেই। সে অনেকদিন আগেই মরে গেছে।

যে-ছেলেটি একদিন এই চা-বাগানে এসেছিল, এম-কম পরীক্ষায় ফারস্ট-ক্লাস পেয়ে, ভবিষ্যৎ-এর অনেক সোজা সরল সুখের স্বপ্ন বুকে করে, সেও বদলে গেছে অনেকই।

পুতন এতদিনে বুঝেছে যে, দুরকম ভাবে বেঁচে থাকা যায় জীবনে। এক, ম্যাদামারা, ল্যাজে-গোবরে; থিতু হয়ে বাঁচা। অন্য; উচ্চাশা, চাহিদা এবং নিত্য নতুন প্রাপ্তি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে বদলাতে বাঁচা। ও ম্যাদামারা জীবন চায় না। যেহেতু চায় না, তাই স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেকদিনই সেই পুরনো পুতনের মনের চেহারাটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে।

বুঝতে পারে ও।

বাগানের কাজে একবার শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল ছুটি থেকে ফিরেই। নর্থবেঙ্গল ট্রাক্টর অ্যান্ড ফার্ম মেশিনারি থেকে তারা এবং আশেপাশের অনেক বাগানেই ম্যাসী-ফার্গুসন ট্রাক্টর কিনেছিল। ট্রাক্টর রিপেয়ার করার জন্যে শিলিগুড়ি থেকে মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়ে ছিলেন ম্যানেজারবাবু।

ট্রাক্টর কোম্পানি এবং নর্থবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিকের সঙ্গে সেভক রোডের কনস্ট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সকালে দেখাই হল না। ওঁদের হিলকার্ট রোডের দোকান থেকে পুতনকে ওঁদের মোটাসোটা কর্মচারী রতনবাবু বললেন যে, বিকেলে আসতে। সেই নেপালি ভদ্রলোকও ছিলেন না। থাপা, না কী যেন নাম।

জিপের ড্রাইভার ঘুঘা বলল, চলেন যাই পুতনবাবু, ধুলাবাড়ি থিক্যা ঘুইরা আসি। ট্রাক্টর এখানেই আনন লাগব, যদি তাগ্যো মেকানিক শ্যাষ পর্যন্ত যাইতে নাইই পারে।

ধুলাবাড়ি? সেখানে কী?

অবাক হয়ে বলেছিল, পুতন।

আরে! ধুলাবাড়ির নাম শোনেন নাই? আপনারে নিয়া হতাই চলে না। নেপালের বর্ডার। পৃথিবীর সব জিনিস পাইবেন সেইখানে। একবার দেইখ্যা আইলে এক্কেরে চক্ষুসার্থক। লাইফ কারে কয়, চলেন, দেখাইমুনানে আপনারে।

ধুলাবাড়িতে যেতে হয় নকশালবাড়ির উপর দিয়ে।

দারুণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।

এক জায়গার নামের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবীর নাম জ্বলজ্বল করে, আর অন্য জায়গায়, চোরা-চালানের মোচ্ছব। প্রয়োজনীয় এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয় সব বিলাসেরই মোচ্ছব সেখানে।

তবে, গিয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে প্রচণ্ড এক জ্বালা অনুভব করেছিল চোখে, গলায়, শরীরের সর্বত্র। টাগরা শুকিয়ে উঠেছিল। এত্ত জিনিস? একজন মানুষের সুখী হয়ে বাঁচতে এত্ত লাগে? এত জামা, গেঞ্জী, ট্রানজিস্টার হেয়ার-ড্রায়ার; রেকর্ড-প্লেয়ার, টি.ভি. ছোট-বড়

সাদা-কালো, রঙিন; বাজনা, ক্যালকুলেটর কার্পেট-ক্লিনার, পারফ্যুম, নানা দেশের নানারকম কায়দার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম!

শালার দাড়িকামানোরও যে এত কায়দা ছিল তা ভাবনারও বাইরে ছিল।

মেয়েদের বডিস। প্যান্টি না কী বলে, কতরকম সাইজের।

কত-রঙা বোতলে বিলাইতি মদ। টাইপ-রাইটার। মায় কম্প্যুটার পর্যন্ত।

জীবনে একজন মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে এত জিনিসের প্রয়োজন হয় বা আদৌ হতে পারে সে কথা কি হালার পুতন সরকার বাপের জন্মে কোনোদিনও ভাইব্যাছিল? এমন কইর‍্যা বাঁচনের নামই বোধহয় বাঁইচা থাকা। এইসব দ্যাখনের পর সকাল-বিকাল দুগা ডাইল-ভাইত খাইয়া লুঙি পইরা চৌকির উপর পাটি-বিছাইয়া শুইয়া থাইক্যা আর শিলির মতো একডা মাইয়ারে বউ কইরা আদর-টাদর, হুম-হাম্ দুচারখানা চুমু-চামা খাইয়া খাওয়াইয়া, ছাওয়াল-পাওয়াল লইয়া ল্যাজেগোবরে বাইচা থাকনের কথা আর ভাবনই যায় না। পিসারে পিসা! এ কি বাঁচনের আয়োজন কও তো দেহি। দুসস্ শালা।

ড্রাইভার ঘুঘা আর পুতনকে দোকানি চা খাওয়াল।

সার-সার দোকান ধুলাবাড়িতে। সবই মারোয়াড়িদের।

বাঙালি রিফিউজি মাইয়াগুলান, নানা বয়সি, খাড়াইয়া আছে। ওরাই নাকি জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী পারাইয়া স্মাগল্-কইর‍্যা ন্যাপাল থিক্যা মাল লইয়া গিয়া শিলিগুড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। দামের উপর ক্যারিং চার্জ একটা লইয়া লয় দুকানিরা। মাইয়াগুলান নাকি রাতে-রাতেই আসে। চেকপোস্টে ঘুষঘায তো দ্যাওনই লাগে। আরও যে কী কী দ্যাওন লাগে, তা জানে কেডায়? সব হালার গরমেণ্টই সমান। জ্যোতিবাবুদের অনেকেই আশা কইর‍্যা ভোট দিছিল এই মাইয়াগুলানও। তা হইলডা কী? যে তিমিরে, হেই তিমিরেই। বাঙালি বইল্যা যে একটা জাত আছে, ছিল কখনো; তাইই কইলকাতা বা শিলিগুড়ি দেইখ্যা বোঝনের উপায় পর্যন্ত নাই। ছ্যাঃ। বড় দুঃখে বুক ফাটে পুতনের। দুঃখ যখন হয়।

শোনলা কি তোমরা? পুতনেরও দুঃখ হয়।

মৃগেন কইতাছিল, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জেরও নাকি হেইরকমই হাল।

যাউকগা। পুতন তো আর ব্যাঙ্গলে স্যাটল করে নাই। বাঙালির প্রবলেম ব্যাঙ্গলের গভর্নমেন্টে বুঝুকানে। তারা তো এহনে আসামের মানুষ। যতদিন না খেদাইতাছে। বাঙালির না আছে জায়গা ব্যাঙ্গলে, না ব্যাঙ্গলের আউটসাইডে। পার্টিশান আর দিল্লীর কর্তারা মিল্যা ব্যাঙ্গলিদের এক্কেরে মাইরা থুইছে না হালায়।

কী খিট্‌ক্যাল কী খিট্‌ক্যাল।

পুতন কী আর কিনবে?

একখানা চাইনিজ কলম, একবোতল রাশিয়ার সস্তা মদ। সাদা জলের মতো। তাই কিনল। এ হালায় আবার কী মদ কেডায় জানে? পেরছাপ না মদ, বোঝাই যায় না। আর একটা আমেরিকান লাল ব্যাঙ্গলনের গেঞ্জী, মাইনা পাছিল গতকাল। তার উপরে ঘুঘার কাছ থিকা ধারও নিল। হালার ধুলাবাড়িতে আইস্যা তো লাভের মধ্যে এই হইল। দুসস্ শালা।

ঘুঘা জিপটা ইন্ডিয়ার দিকে ঘুরিয়ে বলল, ক্যামন দ্যাখলেন, তাই কয়েন পুতনবাবু?

কইস নারে। তুই আমার হকল হব্বোনাশ কইরা ফ্যালাইলি। আর ক্যা?

ঘুঘা, একটা বিলিতি সিগারেটে অমিতাভ বচ্চনের মতো দেশলাই ঠুকে বলল, ইটারেই লাইফ

কয়। বোঝলেন, পুতনবাবু? লাইফ ইটারেই কয়। লাইফ ইনজয় করতে ব্যাশি কিছুর পেয়োজন নাই, বোঝলেন না, অনলি মানি। সবই চাই। বাই হুক্কো অর বাই কুরোক্কো।

পুতন বুঝল যে, কথাটা বাই হুক আর বাই ক্রুক।

বাবার জ্বরটা দুপুরের দিকে কমেছে একটু।

তিনটে নাগাদ বাবা বললেন, পরেশ কি আইছে রে শিলি?

না, এহনে কী? তার আইতে আইতে পরশু হইয়া যাইব গিয়া।

পরশু! কইস কী তুই? গেছে কোনদিকে?

কইয়া তো গেল, যমদুয়ার। সে কি ইখানে। হইবনা পরশু?

শিলি বলল।

যমদুয়ার?

হ।

নরেশবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কাল রাতে গভীর জ্বরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যমের বাড়ি যাচ্ছেন। মস্ত একটা তোরণ। কোনো ফুল-টুল দিয়ে সাজানো নয়, রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানোও হয়নি তা। জায়গাটাও ন্যাড়া সুনসান। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। নদী নেই, ফুল নেই; শিশু নেই কোনো, সেই দেশে। সেই মস্ত তোরণটা করা হয়েছে বাজে পোড়া একটা মস্ত শিমুল গাছ দিয়ে। সেই তোরণের কাছে কোনো পাহারাও নেই। ভিতরে একরকমই দেখতে, একই ডিজাইনের সার সার একতলা কালো রঙা বাড়ি আছে। তাদের দরজা জানালা ছাই-রঙা। এবং প্রতিটি দরজা জানালা হাট করে খোলা। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রপারের মতন অথচ দরজা জানালাগুলোতে একটুও শব্দ উঠছে না। উঠছে না তা নয়, উঠছে মাঝে মাঝে, রোগীর শেষ নিঃশ্বাসের মতন। আর মনে হচ্ছে কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে, কে যেন ডাকছে, ক্রমাগত; ডেকেই যাচ্ছে, আয়! আয়! আয়! কিন্তু কোনো মানুষ নেই। কালো কালো বাড়ি।

গা ছম্ ছম্ করে উঠল নরেশবাবুর।

স্বগতোক্তির মতো আবারও শিলিকে বললেন, যমদুয়ার! সে তো মেলাই দূর রে। কী রে শিলি।

হ! দূরই তো! তবে ঠিক কতখানি দূর তা আমি জানুম কেমনে? মাইয়ারা ত আর শিকারে যায় না।

তা ঠিকই কইছস! কিন্তু মহারানি, রাজকুমারী, ম্যামেরা যায়।

পরেশবাবু বললেন।

অনেকই পুরানো কথা মনে পড়ে নরেশবাবুর। দমকে দমকে, বমির মতন অনেক পুরনো কথা বাইরে আসতে লাগল। কত রঙা সব জিনিস তার সঙ্গে। কোথায় যে ছিল তারা এতদিন স্মৃতির কোন কুঠুরির কোন কোণে, ভেবে অবাক হয়ে গেলেন জ্বরক্লিষ্ট নরেশবাবু। শিলি, তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত গলাতে বলল, বমি করবা নাকি?

নরেশবাবু বললেন না, না।

মনে মনে বললেন, এই বমি অন্য বমি। তুই বুঝবি না রে ছেমড়ি।

অনেকদিন আগে, পার্টিশানের পরপরই একবার তিনিও গেছিলেন যমদুয়ারে শিকারে। হ্যাঁ। তিনিও।

মনে পড়ে গেল।

তবে শিকারি হিসেবে নয়। সঙ্গেই পাউরুটি মাখন আর কলা নিয়ে। ডিম সেদ্ধও। ওই ডিমেই নাকি বিপদ ডেকে এনেছিল। ডিম আর কলা নিয়ে শিকারে গেলেই যাত্রা পণ্ড।

কোকরাঝাড়ের গনা ঘোষের একটা বেবি অস্টিন গাড়ি ছিল। কারখানাও ছিল তাঁর। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী ধবধবে ফর্সা সাহেবের মতন মানুষ। নীলরঙা লুঙি পরে, লাল হাফহাতা শার্ট গায়ে দিয়ে একটা মোড়ায় বসে কারখানার তদারকি করতেন। তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করত তার বড় চার ছেলে। ছোট ছেলেও ছিল। আরও পাঁচটি। আর পাঁচ মিশেলি বয়সের আটটি মেয়েও। ওঁরা উদ্বাস্তু নন। কলকাতার হাওড়া জেলার লোক। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতেন। উঠোনকে বলতেন "বাকুল"। নীচোকে বলতেন "নাবো"। এইরকম। কত কথাই যে মনে পড়ে শুয়ে শুয়ে নরেশবাবুর আজকাল। এসব কথা মানুষ যতদিন কর্মঠ থাকে, কাজের মধ্যে থাকে, ততদিন মনে আসেনা, নিষ্কর্মা হয়ে গেলেই চৌকির অগণ্য ছারপোকার মতো কুটুস কুটুস কামড়াতে থাকে স্মৃতি, অনুক্ষণ।

সেই গনাবাবু, কলকাতার মনাবাবু, বৈদ্য, আর কে কে যেন ছিল। মনাবাবুর এক বন্ধুও ছিলেন। অজিত সিং। একটা রাইফেল নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

মনাবাবুরা কলকাতা থেকে গৌরীপুরে এসেছিলেন সেখানে সকলে জমায়েত হয়ে এই পথ দিয়েই যমদুয়ারে যাবার সময়ে নরেশবাবুকে তুলে নিয়ে গেছিলেন। শীতকাল ছিল। মনে আছে। আর শীত কী শীত!

জীবনে সেই প্রথম রাইফেল দেখেন নরেশবাবু।

তামাহাট থেকে বড়বাধা, গুমা রেঞ্জ হয়ে, কচুগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ার। যমদুয়ারে পৌঁছবার আগেই সন্ধে হয়ে গেল আর হাতির পালে ঘিরে ফেলল সেই বেবি-অস্টিন গাড়ি। কী খিট্‌ক্যাল! কী খিট্‌ক্যাল! যমদুয়ার, সে তো ভারী গহন জঙ্গল। একপাশে বাংলার ডুয়ার্স, অন্যপাশে ভুটান। মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সংকোশ নদী। বড় বাঘ, হাতি, বাইসন, চিতা, কোনো জানোয়ার নেই সেখানে?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন বললেন পরেশবাবু, কইস কী রে শিলি? যমদুয়ারে গ্যাছে পরেশ? হ্যাঁ।

সঙ্গে গেল কেডায় কেডায়?

ধুবড়ি থিক্যা আইছিল, শিকারিরা। বড় শিকারি। ভয় নাই তোমার। ছাত্তার চাচায়ও সঙ্গে গ্যাছে। এক সাহেবও আছে নাহি কইতাছিল কাকায়।

ভয় নাই? কস কী? ভয় তো হের লইগ্যাই। ছাত্তারটা না করতি পারে এমন কামই নাই। তার বাবারেও বাঘে খাইছে। অরেও খাইব। পরেশারে ক্যান যে এই মরণের নেশায় পাইল! কত নেশাই ত মানুষে করে। কিন্তু এ কি গরিবগো ন্যাশা? রাজা-রাজড়া, জমিদার; যাগো অন্নচিন্তা নাই, তাগো হ্যাই সব মানায়। না করে রোজগার, না করল বিয়া, ইটা কী?

একটু পরই বাবা বললেন, দুগা মুড়ি ভাইজা দে দেহি। তেল দিবার লাগব না। আর এট্টু পিঁয়াজ। কাঁঠালের বিচি ভাইজা দিবি নাহি এট্টু?

না না। কাঁঠালের বিচি খাইয়া কাম নাই। এত জ্বর। প্যাটের গোলমাল বাধাইবা আবার জ্বরের উপরে। আমি পড়ুম বিপদে।

যা ভালো বোঝস্ তুই। তবে, কাল আমার জ্বর ছাইড়া যাইব। মন কইতাছে। এতক্ষণ তো আবারও কম্প দিয়া জ্বর আসনের কথা ছিল। আইল না যহন, তহন, ছাইড়্যাই যাইব গিয়া। এই শৈলেনের ভাইডা, আমাগো ডাক্তার খুব ভালো। গদাই-এর বাপে তারে যাইই কউক না ক্যান্!

বাবাকে একটু আদার রস দিয়ে গরম চা আর মুড়ি-ভাজা খাইয়ে, জ্বরটা আরেকবার দেখে ক্যাবলাকে

বাবার কাছে রেখে, গা ধুয়ে নিল শিলি। তারপর চলল পুতনদাদের বাড়ি। ভাবছে, রাতে একটু সুজির খিচুড়ি রেঁধে দেবে। অথবা সাবুর। কয়েকটা আলু আর পটল ফেলে। আদা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে। মসুর ডালের। বাবাকেও দেবে একটু। বুধাই গাইয়ের ঘি তো আছেই। অনেক ঘি খেয়েছে, দুধ খেয়েছে ছোটবেলা থেকে শিলি। কিন্তু বুধাই-এর দুধের যেমন গন্ধ, তেমনি ঘি-এর। এমন লক্ষ্মী আর মিষ্টি গাই কখনো দেখেনি। তেমন মিষ্টি হয়েছে বাছুরটা।

পুঁচকি।

নামটা দিয়েছে, শিলিই।

পুতনদাদের বাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে গেল না। সেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে আলোকঝারি পাহাড়ের দিকে মুখ করা পথটা ধরল ও।

এই শেষ বিকেলের এই সময়টা বড় প্রিয় সময় শিলির। পৃথিবী কেমন যেন নরম বিবাগী হয়ে যায় এই সময়টাতে। দিনের অন্য সময়ে যা-কিছুই সে নামঞ্জুর করত, গররাজি নারীর মতন, এই সময়ে সেইসব আর্জিও সহজে মঞ্জুর করে দেয়। মৈজুদ্দিন চাচার সন্ধ্যার নামাজের মতো এক বিষণ্ণ সুর বাজে এই শেষ বিকেলের আলোয়। সজনে গাছের ফিনফিনে পাতাদের গায়ে শিহর তুলে উড়ে যায় দুর্গা টুনটুনি। বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায় নেংচে হেঁটে যায় মস্ত লম্বা লেজ নিয়ে, ছায়াচ্ছন্ন বনের ছায়া ঝাঁট দিয়ে; সেই একলা, মস্ত বড় বাদামি কালো পাখিটা।

পরেশকাকু একদিন বলেছিল এর ইংরিজি নাম, ক্রো-ফ্রেজেন্ট। গতবছর। হিতুকাকু আসত প্রায়ই তামাহাট থেকে। অনেক পাখি আর ফুল চিনত সে। পুতনদাটা চিরদিনই কাঠকাঠ। যে সব ছেলেরা আই-কম-বি-কম পড়ে, তারা বেশিরভাগই ওরকম হয়। কেন, কে জানে? আর যারা খাতা-টাতা লেখে, মুহুরি আর অ্যাকাউনট্যান্ট; তারা তো যাচ্ছেতাই। নস্যি নেয়। গোমড়ামুখো। নাকে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা থাকবেই। কথাবার্তা কারও সঙ্গেই নেই। খালি বলবে; জাবদা, খতিয়ান, হরজাই খাতে, নাজাই খাতে; এই সব।

শিলি এইসব জানে, কারণ শিলির ছোটমামা মুহুরি ছিলেন। এখন ধুবড়ির এক মহাজনের কাছে কাজ করেন। টাউন স্টোর্স-এর শচীন রায়দের কাছেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ধুবড়ি শহরে।

শিলি যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন কিরণশশী রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে চালতা মাখছিলেন। শিলিকে দেখেই বললেন, আইছস? তর লইগ্যাই মাখতাছিলাম। তর বাবায় কেমন?

বাবা এহনে ভালো। মনে হইতাছে জ্বর এক্কেরেই ছাইড়া যাইব গিয়া কাইলই সকাল লাগাদ।

যা তো! রান্নাঘর থিক্যা দুইটা রেকাবি লইয়া আয় ত শিলি।

শিলি, রেকাবি এনে বলল, পিতলের উপর টক থুইব্যা? খারাপ হইয়া যাইব না?

তুইও য্যামন্। তরে পিতলের রেকাবি আনতে কইল কেডায়! পাথরেরডা আন।

শিলি, ঘরের ভিতর থেকে বলল, শ্বেতপাথরের, না লালপাথরের না কালাপাথরের? কোন পাথরের? কোন পাথরের আনুম তা ত কইবা?

নছল্লা থো তো তোর ছেমড়ি! পলকে লইয়া আয়।

শিলি একটু চালতা-মাখা মুখে দিয়েই চোখ মুখ নাচিয়ে জিভটা টাগরাতে ঠেকিয়ে বলল, উ-উ-উ-উ-ম্-ম্-ম্! বুড়ি তোমার মতন ত কাউরেই দ্যাখলাম না আইজ অবধি। সত্যই কই। চালতা, কাঁচা লঙ্কা, এট্টু লবণ, এট্টু কাঁচা মরিচ, এট্টু চিনি আর বেশি কইর‍্যা ধইনাপাতা। আহা স্বোয়াদখান কী? য্যান, হাতে চাঁদ পাইছি। এমন স্বোয়াদ পিরথীবির আর কিছুতেই নাই। কী ভালোই যে লাগে না বুড়ি।

কিরণশশী, শিলির অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, চালতা-মাখার চেয়েও

অনেক স্বাদু জিনিস এই পৃথিবীতে আছে। কত কী পাগল করা অনুভূতি! এমন এমন মুহূর্ত, যখন মনে হয় জীবনের সব শত্রুকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিই। ওতো জানেনা সে সব! জানবে, বিয়ের জল গায়ে পড়লে।

তারপর নিজের মনেই না-বলে বললেন, জীবনভর তো আনন্দই। দুঃখ কতটুকু? এই চালতা-মাখার স্বাদেরই মতো টক্-টক্ মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাল-ঝাল এই জীবন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

লোকে জানে, বিধবা, একা, কিরণশশীর অনেকই দুঃখ। যারা তা জানে, তারা কিছুই জানে না। সুখ তাঁর চারধারেই ছড়ানো আছে। ঝরাপাতার মতো, মিষ্টি ধুলোর মতো; বাড়ি ফেরা গাইয়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধরই মতো সুখ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে। শুধু তাকে চিনে নেওয়া চাই। মুহূর্তগুলোকে শুধু হারিয়ে যেতে দিতে নেই।

এসব গভীর কথা শিলি কী করে বুঝবে? ও তো ধুলোর মধ্যে ঘর-বানানোর খেলায় মেতে-থাকা চঞ্চল ছটফটে দুরন্ত চড়াই। যে ঘর বানায়নি, ঘরে থাকেনি কখনো, সেই মেয়েই কল্পনার ধুলোয় ঘর বানিয়ে এমন ছটফট করে। ধুলাবাড়ি। বাড়ি নয়। বেচারি জানবেই বা কী করে! এক একটি করে বছর হারিয়ে, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে বার্ধক্যে পৌঁছে, জীবনের পিছনে ফেলে আসা পথের ধুলোয়। মানুষ যা-কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসে, হারিয়ে আসে, নিয়েও আসে; তার নামই তো জীবন। অভিজ্ঞতার আরেক নামই জীবন। যা বয়স হারিয়ে পাওয়া যায়, তা কি বয়স না-হারিয়ে কখনোই পাওয়া যায়?

শিলিকে বসিয়ে, রান্নাঘরের দাওয়ায় পা-ঝুলিয়ে বসে চালতা-মাখা খাওয়া শিলির খুশিমুখের দিয়ে চেয়ে, ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রথম যৌবনে ফিরে যান কিরণশশী। শিলির বয়সে। তাঁর ফোকলা মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কুঁচকে-যাওয়া, কালিপড়া চোখ দু'খানিতে এক প্রসন্ন কৌতুক ভোরের প্রথম আলো পড়া শিশির বিন্দুর মতো ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

শিলি মুখ ঘুরিয়ে, কনে-দেখা আলোয় কিরণশশীর মুখের হাসি দেখে। প্রথমে অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেও হেসে ফেলে।

বলে, মরণ। হাসো ক্যান মিটমিটাইয়া? ও বুড়ি?

বুড়ি আবারও হাসেন।

আরে! কইবা তো! এত হাসনের হইলডা কী?

তরে দেহি আর হাসি।

না। হাসবা না। কইয়া দিলাম।

ক্যান্? হাসির উপরও ট্যাক্সো চাপছে না কি?

তারপর দু'জনেই আবার হেসে ওঠে।

হাসতে হাসতে, শিলির আঁচল লুটিয়ে পড়ে বারান্দার দাওয়ায়।

এমন করে আগল খুলে, নিভৃতে দু'জন নারীই শুধু হাসতে পারে।

উঠোনের কোণা অবধি এগিয়ে-আসা একটা কাঠবেড়ালি হাসির শব্দে ভয় পেয়ে তরতরিয়ে সুপুরি গাছের উপরে উঠে যায়। গাছের অনেকখানি উপরে উঠে, লেজ তুলে তুলে শিহরভরে ডাকে, চিঁহর-চিঁহর-চিরিপ্-চিরিপ্-চিরিপ্। আর ঠিক সেই সময়ই গৌরীপুর থেকে আসা বিকেলের বাসটা তামাহাটের দিকে চলে যায় পঁক পঁক করে বাল্‌ব-হর্ন বাজিয়ে।

সন্ধে হল।

পুতনদাদাদের বাড়ির মোতি গাই ডাকে গোয়ালঘর থেকে, হাম্বা-আ-আ-আ। লিচু গাছের ডাল

ছেড়ে বাদুড়েরা পা-আলগা করে ভেসে যায়। অন্ধকারে মিশে যায় তাদের ডানায় সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ শব্দ।

রমজান মিঞার ছোট ছাওয়ালটা সারাদিন শুকিয়ে-যাওয়া চৈত্রের পুকুরে পোলো দিয়ে দিয়ে কই-সিঙ্গি মাছ ধরে। দিনশেষে আব্বাসউদ্দিনের গান গাইতে গাইতে পুতনদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। গলা ছেড়ে গান গায় সে: বগা কান্দেরে, তোর্ষানদীর পারে পারে, ফান্দে পইড়্যা বগা কান্দেরে...

চৈত্র শেষের সন্ধ্যার কাঁসারঙা আলোয়, শ্যাওড়া গাছের গন্ধ, বাছুরের গায়ের গন্ধ, হাসনুহানার গন্ধ, সদ্য-চেরাই-করা হরজাই কাঠের মিষ্টি গন্ধের মধ্যে, গা-মাথাময় পুকুরের পুরনো কাদা আর শামুক-গুগলির, কই-সিঙ্গির আর গুঁড়িগুঁড়ি শ্যাওলার গন্ধ গায়ে মেখে আলিমুদ্দিন এসে দাঁড়ায় উঠোনে।

বলে, ফুফা, একখান সানকি দাও দেহি। শিলিদিদিরে মাছ দিয়া যাই কয়খান।

শিলি হাসে।

বলে, খুব যে পেরেম দেহি রে ছ্যামড়া। কাইলকা হক্কালে আইস্যা, টাহা কয়ডা চাইবি তা ক' দেহি আগে?

আলিমুদ্দিন হাসে?

মিষ্টি ছেলেটা। বলে, টাহাই কি দুনিয়ায় সব শিলিদিদি? তুমি একবার হাইস্যা দিও তাইলেই হইব। দাম নিমু না। পেরেমটা চিনলানা, টাহাই চিনলা শুধু। তোমাব কপালে পেরেম লাই।

তবে রে ছ্যামড়া।

কপট-ক্রোধে শিলি তেড়ে যায় আলিমুদ্দিনের দিকে।

হাসতে হাসতে, কপট ভয়ে, আলিমুদ্দিন পিছিয়ে যায়।

মাছ ঢেলে দিতে দিতে বলে, দাম নিমু না। হত্যই কইতাছি শিলিদিদি। একদিন আইমু অনে পুতনদা আইলে পর। গান শুনাইও দিদি একখান, পূর্ণিমার রাতে, বারান্দায় বইস্যা। আহা! গান তো গাওনা তুমি, মনে হয় গঙ্গাধরে পূর্ণিমার রাইতে পাল তুইল্যা নৌকা ভাইস্যা যাইতাছে গিয়া। পরাণের মধ্যেটা কেমন কেমন করে য্যান।

শিলি আর কিরণশশী বলেন, যাত্রায় পার্ট করস না ক্যান তুই? গান তুইও তো খারাপ গাস না রে ছ্যামড়া।

আলিমুদ্দিন হাসে। বলে, মোক নেয় কেডায়, তাই কও। আলিমুদ্দিন তোমাদের গান শুনাইতে পারলেই সুখী। আর কিসুর লোভ নাই।

তারপরে বলে, গান তো গায় ফুফা সব পাখিতেই। কোকিল কি সবাই হইতে পারে? কও দেহি? আমাগো শিলিদিদি হইতাছে কুমারগঞ্জের কোকিল।

হইছে। ফাইজলামি রাইখ্যা এখন বাড়ি যাইয়া ধোয়াপাকলা কইরা চান কইর‍্যা ফ্যালা। রাত হইয়া গেল। এতক্ষণ, কী মাছ ধরতাছিলি তুই?

হঃ। হুদাই মাছ? এক একবার পোলো ফ্যালাই, পোলোর মধ্যে হাতটারে ফেরাই আর কত কী ভাবি। ভাবি, আমার বেহেস্ত আর দোজখ দুইই আছে এই পোলোর মধ্যেই। কোনটারে ফ্যালাই আর কোনটারে উঠাই? বাস এই করতা করতাই দিল এক ব্যাটা সাপে কামড় দিয়া।

সাপ?

শিলি চমকে উঠল।

তারপর?

কিরণশশী বললেন।

কী সাপ?

শিলি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।

কিরণশশী আবার বললেন, তারপর? তারপর আর কী? দোজ্‌খে যে হাত দিছি বোঝাই গেল তা।

বলেই, ফুলে-যাওয়া হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, ত্যামন সাপ হইলে তো কামই সারত যাইত গিয়া এতক্ষণে।

তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, জল-ঢোঁড়াই হইব।

বলেই বলল, মাছগুলান লইয়া লও ফুফা। যামু এবার। কাদায় চিড়বিড় করতাছে গা।

সাবধানে যাইসানে ভাইডি। বাঁশবাগানের তলায়ও একজোড়া গোখরার বাসা আছে। জানস তো?

জানি জানি। বুকের মধ্যে কত গোখরার ছোবল খাই, গোখরারে আমি ডরাই না।

বুকের মধ্যে ছোবল? হেডা আবার কী?

শিলি বলল, অবাক হয়ে।

ক্যান। তোমার হাসি।

আলিমুদ্দিন বলল।

এইবার আমি তরে মারুম। পালা। যাইবি কিনা ক' তুই।

যাইতাছি। এই পলাইলাম।

বলেই, আলিমুদ্দিন আধো-অন্ধকারে কাদা-মাখা একটি মস্ত ভোঁদড়ের মতো দুপায়ে থপথপ করে চলে গেল।

শিলি গলা তুলে বলল, যাওন নাই রে, আসিস আলিম্‌ ভাই আবার।

আ-সু-ম্‌।

গলা তুলে বলল, আলিমুদ্দিন দূর থেকে।

তার গলার আওয়াজকে, লট্‌কাগাছের ঝুপরি পাতাগুলো অন্ধকারে কপাৎ করে গিলে ফেলল।

ওদের চালতা খাওয়া হয়ে গেছে। হোন্দলের মা এতক্ষণ হ্যারিকেন আর রান্নাঘরের লম্ফ পরিষ্কার করছিল। সব ঘরের বারান্দায়, ছাই দিয়ে কাচ মেজে, ঝকঝকে করে, হ্যারিকেন রেখে গেল।

শিলি বলল, গাছের ছায়া-ঘেরা মিটমিটে আলোতে ঘন হয়ে ওঠা উঠোনভরতি অন্ধকারে, লজ্জা লজ্জা গলায়; পুতনদার চিঠি কি আইছে? বুড়ি?

নাঃ।

কিরণশশীর দীর্ঘশ্বাস চাপা এই "না"টা অন্ধকার তারাভরা আকাশের দিকে দুটি নারীর চারটি উঁচু-করা প্রতিবাদের হাতের মতো বলে উঠল না, না, না।

দুজনের মনেই কু ডাক দিল। নীরবেই মনে মনে দুজনে বলল, দুজনের মতো করে, ও আসবে—না, ও আর আসবে না ফিরে। তাইই চিঠি লেখে না ও!

কিরণশশী বললেন, শিলিকে কাকুতি করে, তুই লিখছিলি কি অরে?

হ।

কবে?

গত মাসে।

গত মাসে। তারপর আর একবার লিখতে কী হইছিল? আঙুলে কী বাত ধরছে তর?

তা না। তোমার পোলারে তুমিই লিখবা। আমি ক্যান বারেবারে লিখুম? জবাব যে দ্যায় না, তারে লিখুমই বা ক্যান? স্যা আমার কেডা?

কিরণশশী কিছু না বলে, চুপ করে বাড়ির পশ্চিমে চেয়ে রইলেন।

আকাশে তখনও ফিকে গোলাপি আভা ছিল সামান্য। এক ঝাঁক সল্লি হাঁস কোণাকুণি উড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। আলোর সামান্যতম আভাসও আর রইল না।

শিলি উঠল। বলল, যাই বুড়ি।

কিরণশশী বিড় বিড় করে, শীতের দীর্ঘরাতের আগুনের মতন বলল, যাওন নাই মাইয়া। আইস্যো।

সংকোশ নদীটা তার বরফ-গলা স্বচ্ছ জল বুকে করে দুপাশের নিবিড়, ভয়াবহ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। নদী পার হলেই ভুটান। ভুটানের মহারাজা প্রতি বছরই এক দুবার হেলিকপটারে করে থিংম্পু থেকে যমদুয়ারে চলে আসেন শিকারের জন্যে। ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, অথচ যমদুয়ারে পাওয়া যায় না, এমন প্রাণী খুব কমই আছে। হাতি, বাঘ, বাইসন, (গাউর), বুনো মোষ, চিতা, শম্বর, চিতল হরিণ, কোটরা, নানারকম সাপ, নদীর জলে দ্রুত সাঁতরে যাওয়া কালো ও লাল মাছের মস্ত মস্ত ঝাঁক, কী যে নেই এই গহন, ভয়াবহ বনে, তা খোদাই জানেন। ভাবে, আবু ছাত্তার। পাখি, নানারকম প্রজাপতি।

যমদুয়ার বাংলো থেকে মাইল দুয়েক দূরে পরেশ আর ছাত্তার সংকোশ নদীর পাশে একটি মোষের বাথানে বসেছিল।

নেপালিদের বাথান। প্রায় শ'খানেক মোষ আছে। ঘি তৈরি করে, তারা পৌঁছে দেয় ভুটানে। সংকোশের এক পারে ভুটান। আর অন্য পারে আসাম এবং পশ্চিমবাংলা।

নদীতে চান করে উঠেছে ওরা। তারপর দুপুরে ময়ূরের ঝোল আর ভাত দিয়ে ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর কষে ঘুম লাগিয়েছিল। রাতের বেলাতে বাথানের নেপালিদের সঙ্গেই খেয়ে নেবে। নেমন্তন্ন করেছে ওদের, নেপালি গোয়ালারা। আজই সকালে একটা কুটরা হরিণও মেরে ওদের দিয়েছিল। তারই ঝোল, মেটে-চচ্চড়ি আর ভাত খাবে রাতে। খিদেটাও বেশ চনমনে হয়েছে।

ক্যামেরন সাহেব যমদুয়ারের দোতলা বন-বাংলোতে আছেন। কলকাতা থেকে একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছেন উনি। বড়ঘরেব মেয়ে। মহামূল্য বেশ্যা। রূপ ফেটে পড়ছে। বয়সও ত্রিশের নীচে। কিন্তু হলে কী হয়, বেশ্যারা বেশ্যাই। তাদের রকম-সকম চলন-বলন, তারা যতই সম্ভ্রান্ততা দিয়ে ঢেকে রাখুক না কেন; ঘরের বউ আর টানা মালে তফাত থাকেই।

চোখের সামনে ক্যামেরন সাহেবের ওই বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারে না পরেশ। জন্মেছিল বিত্তশালী পরিবারে কিন্তু ছেলেবেলাতে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছিল জন্মভূমি ছেড়ে, এক বস্ত্রে। "ইজ্জতের" জন্যে। যে ইজ্জতের জন্যে অনেক মূল্য দিয়েছে তারা সকলে, সেই ইজ্জতই কেনা-বেচা করছে এরা চোখের সামনে। যে দৃঢ়মূল, রক্ষণশীল মানসিকতাতে তারা মানুষ হয়েছে তাতে এই সব বড় চোখে লাগে। সহ্য করা মুশকিল হয়। অথচ প্রতিবাদও করতে পারে না। সে ক্ষমতা নেই। ফলে মনের মধ্যে সবসময়েই একটা চাপা উত্তেজনা গুমোট মেরে থাকে। দমবন্ধ লাগে। অমন উদার খোলামেলা পরিবেশেও নিশ্বাস নিতে পারে না যেন।

আবু ছাত্তার বড় স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। বড় বাঘ তাকে পেড়ে ফেললেও, সে যেমন নিরুত্তাপ থাকে, চোখের সামনে দোতলার খোলা বারান্দায় দিনের বেলাই প্রায় ন্যাংটো মেয়েকে নিয়ে ক্যামেরন সাহেবের রমদা-রমদি দেখেও ও তেমনই নিরুত্তাপ। তবে, ছাত্তারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। দেখতে পায়, বুঝতে পারে পরেশ। আর চোয়াল শক্ত হলেই ভয় পায়।

বেশ কয়েকবছর পরে, এইরকম চোয়াল শক্ত করেই ছাত্তার তার বন্দুক তুলে নিয়ে তার এগারোজন রক্তের আত্মীয়কে একই দিনে গুলিতে শেষ করে দিয়েছিল।

মানুষটা বাঘের সঙ্গে কারবার করত। সাহসের কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু নোংরামি নীচতা এসব সহ্য করতে পারত না। পারত না ভণ্ডামি।

ছাত্তারের ব্যক্তিগত আইন নিষ্ঠুর ছিল। ভয়াবহ ছিল, কিন্তু তা অন্যায় ছিল না, নীচ ছিল না।

এই ক্যামেরন সাহেবদের হাব-ভাব দেখে পরেশেরও একধরনের ঘৃণা জন্মে গেছে। মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেলে ও, সংকোশের বহমান স্বচ্ছ জলে। ওর থুথু ভেসে যায় দ্রুত। ঘুরপাক খেতে খেতে হারিয়ে যায়। জলের নীচে নানা-রঙা নুড়ি দেখা যায়। মহাশোল মাছের ঝাঁক, কালো ছায়া ফেলে সাঁতরে যায় গভীরে গভীরে। জলের গভীরে আষাঢ়ের মেঘের মতো মনে হয় সে চলমান মাছের ঝাঁককে।

কাল বিকেলের আগেই ভুটানের দিকে একটা ল্যাংড়া, বাঁজা মোষকে বেঁধেছিল পরেশরা বাঘের জন্যে। যে মোষ দুধ দেয় না তার কোনোই প্রয়োজন নেই বাথানের গোয়ালাদের কাছে। গোস্ত করবে বলে কিনতে চায়, মুসলমান যাযাবর ব্যবসায়ীরা। কিন্তু নেপালিরা কট্টর হিন্দু। যদিও দুর্গাপুজোর সময় মোষ বলি দেয় তারা, কেউ জবা করে খাবে তা জেনে ল্যাংড়া, বাঁজা, অকর্মণ্য দামহীন মোষও বেচে না।

টাকা যাদের খুবই দরকার, তাদেরই দেখা যায় যে টাকার জন্যে হাহাকার না-করতে। টাকার জন্যে নিজেদের নিজস্বতা বিকিয়ে না দিতেও। সেই লোভ আছে শহরের মানুষদের। পরেশ ভাবে, একদিন শহরের মানুষেরা পুরো পৃথিবীটাকে নষ্ট-ভ্রষ্ট করে দেবে। এই গাছ থাকবে না, এই ফুল, এই বাঘ, এই শান্তি এবং এই মানসিকতাও। পেনসান এবং পুঁজিহীন রিটায়ার্ড পুরুষদের যেমন অবস্থা সংসারে, অনেকটা তেমনই অবস্থা ওই মোষটার। তবু ওকে কেউই অসম্মান করে না। না গোয়ালারা, না অন্য মোষেরা।

প্রায় প্রতি রাতেই বড় বাঘ এসে বাথানে হামলা করে, যদিও বাথানের শক্ত কাঠের বেড়ার মধ্যে ঢুকে মোষ নেবার সাহস কোনো বাঘেরই নেই। একসঙ্গে বাঘিনি এবং বাচ্চারা থাকলেও নয়। তবুও হম্বি-তম্বি করে। মোষগুলোও বোঁ-বোঁ-ও করে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে। দাপাদাপি, ঝাঁপাঝাঁপি হয় অনেকক্ষণ। ঘুমের দফা-দফা। মশাল হাতে করে গোয়ালারা ঘেরার মধ্যে থেকেই লম্ফ-ঝম্ফ করে। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভয় দেখায় বাঘকে। ঘেরার বাইরে অবশ্য বেরোয় না। মোষদের রক্ষাকবচ ছাড়ে না।

একে বড় বাঘ, তায় রাত বলে কথা।

সচরাচর বাথানের মধ্যে রাতের বেলা বাঘে কিছু করতেও পারে না। অনেক মোষ যে থাকে একসঙ্গে সিং উঁচিয়ে। মোষ ধরে বাঘে, দিনের বেলাতেই, যখন কোনো মোষ চরতে চরতে একলা হয়ে যায়, তখন। তবু রাতে এসে ভয় না-দেখালেও যেন চলে না তাদের।

ল্যাংড়া, বাঁজা মোষটাকে মেরেছিল বাঘ গতকালই শেষ রাতের দিকে। মড়িটাকে বেঁধে ছিল অবশ্য বুদ্ধি করে বাঘের চলাচলের পথেই কাল। খেয়েছে সামান্যই। তাই আজ রাতে যে মড়িতে আসবেই বাঘ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

ছাত্তার আর পরেশ বাঘের পায়ের দাগ দেখে বুঝেছে যে, মস্ত বাঘ।

নেপালিরাও বলেছিল যে, অত বড় বাঘ সারাজীবন বনে বনে ঘুরেও দেখেনি ওরা। মোষটা ভালো করে বাঁধা না থাকলে ওই বাঘের পক্ষে অতবড় মোষকে বয়ে নিয়ে ভুটান হিমালয়ের খাড়া পাহাড়ে উঠে চলে যাওয়াও অসুবিধার ছিল না। একটি বড় বাঘ তার শরীরে যে কতখানি শক্তি ধরে তা যারা বাঘকে জেনেছে, তারাই জানে।

খুব ভালো করে, শক্ত করে মাচা বেঁধেছে ওরা, সারা সকাল ধরে। চারজন লোককে নিয়ে।

ক্যামেরন সাহেব বাঘ মারবেন বলেই এখানে এসেছেন। এখন মানে মানে মারতে পারলেই ভালো। যদি না মারতে পেরে, আহত করেন তবে সেই বাঘকে পিছা করে মারার কাজ হবে পরেশ আর ছাত্তারেরই। পেশাদার শিকারি ওরা।

ক্যামেরন সাহেব নিজেই বাঘ মারতে পারলে দুশো টাকা দেবেন বলেছেন আর আহত করার পর সেই বাঘকে যদি ছাত্তারদেরই পিছা করে রক্তের দাগ দেখে দেখে খুঁজে বের করে শেষ করতে হয়, তবে তিনশো টাকা। সাহসী শিকারিদের কোনো সম্মান দেয়না এই সব মিথ্যাচারী, জালি মানুষেরা। সম্মানটা নিয়ে নিয়ে, টাকাটা হাতে ধরিয়ে দেন।

পরেশ ভাবে, ওই পাঞ্জাবী মেয়েটার সঙ্গে আসলে হয়তো ওদের নিজেদের বিশেষ তফাত নেই। ওরা বেচে, ওদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস; আর মেয়েটা বেচে অন্য কিছু। ওরা সবাই অসহায়।

তবে, ওদের, অসহায়তার রকমটা আলাদা।

ভাবে পরেশ কে জানে! হয়তো ক্যামেরন সাহেবও অসহায়। তার অসহায়তার রকমের খোঁজ হয়তো, তাঁরা রাখে না। প্রাণ বিপন্ন করেও বাঘের চামড়া বাইসনের বা বুনোমোষের মাথা, হাতির দাঁত তারা এনে দেয় শৌখিন আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন শিকারিদের পায়ের কাছে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে।

টাকার বড় দরকার পরেশের। ছাত্তারেরও টাকার দরকার কম নয়। তাইই ওরা চাইছিল ক্যামেরন সাহেব কোনোক্রমে গুলি ছোঁয়াক একবার বাঘের গায়ে। তারপর ওবাই দেখবে। মাথা-পিছু পঞ্চাশটা করে টাকা বেশি পাওয়া সোজা কথা নয়। যা বাজার!

বাঘ শিকারের ওই নিয়ম। যে আগে রক্ত ঝরাতে পারবে, বাঘ তার। সেই প্রথম গুলি, লেজেই লাগুক, কি কানের পাতাতে। রক্ত ঝরলেই হল।

তবে ক্যামেরন সাহেবকে পাঠিয়েছে গৌহাটির ল্যাম্পুন সাহেব। ল্যাম্পুন সাহেব কিন্তু ভালো শিকারি। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে না ওদের যে, এই ক্যামেরন সাহেব শিকারের কিছু জানেন বলে। শিকারে তাঁর মনও নেই। শিশু যেমন সুন্দর খেলনা পেয়ে পৃথিবী ভুলে মত্ত হয়ে যায়, ক্যামেরন সাহেবও পাঞ্জাবী মেয়েটাকে নিয়ে তেমনই মত্ত। মেয়েটা যেন দুর্মূল্য আইসক্রিম। এখুনি চেটে পুটে শেষ আর্দ্রতাটুকুও না খেলে যেন গলে গিয়ে আঁজলা গলে গড়িয়ে যাবে সব রস, মিষ্টত্ব!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভালো করে ঘুম দিয়ে উঠল ওরা দুজনে। রাতে জাগতে হবে। কে জানে, সারা রাতই জাগতে হবে কি না। বাঘের মতিগতির কথা কি বলা যায়? মড়িতে এসে হয়তো হাজির হল একেবারে শেষ রাতে।

ঘুম থেকে উঠেই পরেশ বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি!

ছাত্তার ভালো করে জানে, কোথায় ঘুরতে গেল পরেশ। ওই একটিই কমজোরি পরেশের। পৃথিবীর সমস্ত বাহাদুর মানুষদেরই কোনো না কোনো কমজোরি থাকেই। থাকাটা অবধারিত।

ভুটানের দিকেই পাহাড়ের নীচে খড়ের ঘরে মদ পাওয়া যায়। ভুটানে তৈরি হুইস্কি। পাঁইটের বোতল। কমলালেবুর ছবি আঁকা। কমলা রঙা। সাদা লেবেলের উপর। নাম, ভুটান-অরেঞ্জ।

ছাত্তার মদ ছোঁয় না। ওর নেশার মধ্যে গুয়া-পান। শুধুই গুয়া-পান।

কেউ মদ খাক, তাও পছন্দ নয় ছাত্তারের।

পরেশ যাওয়ার সময়ে, ছাত্তার বলল, ক্যামেরন তো মাতাল হইবই, তুই বেশি খাস না। অত বড় বাঘ! মাতলামি যদি করিস, আমি কিন্তু তোক্ গুলি করুম।

থোও, থোও! পরেশরে কোনোদিন মাতাল হইতে দেখছ তুমি! যত্ত ফাক্সা কথা!

তাড়াতাড়ি আসস কিন্তু। দেরি যদি করস, তো খারাপ হইব। ভুটানি ছুকরিও তো আছে ওই দোকানে। কী হয় না হয়; আমি সবই জানি।

মুখ সামলাইয়া কথা কইও মিঞার পুত্। তোমার জিভখান্ কাইট্যা ফেলাউম। ওই সব মাইয়া-ফাইয়ার ধান্দা আমার লাই। মদ খাই; মদ খাই!

না থাকনই ত ভালো।

অবিশ্বাসী স্বগতোক্তি করল ছাত্তার।

পরেশ, একা একা চৈত্রর নদী পেরিয়ে ভুটানের দিকে যাচ্ছিল। মন্থর পায়ে। চৈত্রদিনের বিকেলের মধ্যেই একটা মন্থরতা আছে। সবকিছু শ্লথ হয়ে যায়, ভিতর বাহির।

ঘন, গহীন বন, পাহাড়ের গায়ে। পেছনে। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে। যমদুয়ারের সেগুন আর শালগাছের কাণ্ডর বেড় দশজন মানুষের দু হাতেও দেওয়া যায় না। এই বনে, গা ছমছম করে দিনের বেলাতেও। ছায়াচ্ছন্ন সবুজ অন্ধকারে ঢাকা থাকে দুপুরের রোদও, অনেকই জায়গাতে। যেখানে জঙ্গল ঘন।

এই ছমছমানির প্রেমেই পড়েছে আসলে পরেশ। চাকরি করল না, থিতু হল না। বিয়ে করল না কোনো দায়-দায়িত্বই নিল না জীবনে, শুধু এই ছমছমানিরই প্রেমে পড়ে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলেরই সঙ্গে। কী ভালো যে লাগে, এমন গহন জঙ্গলে এলে! মদ খায় মাঝে মধ্যে। নেশা করার জন্যে নয়। নেশা, তার জঙ্গলে এলে: এমনিতেই হয়। সেই নেশাকে জমাট করে তোলার জন্যেই মাঝে মাঝে একটু-আধটু খায়। জঙ্গলে বসে মাল খাওয়ার আনন্দই আলাদা। প্রকৃতির প্রভাবেরই মতো, হুইস্কির প্রভাবও আস্তে আস্তে চারিয়ে যায় নিজের ভিতরে। ধীরে ধীরে। বেলা শেষের বুনো হাঁস, যেমন করে ম্লান রক্তিম আলোয়, সারারাতের স্থির জলজ শীতের জন্যে তৈরি হয়ে যায়।

ছাত্তার মিঞা, এই মদ-ফদ কোনোদিন জিভেও দেয়নি। ও কী করে জানবে, ভুটান অরেঞ্জের স্বাদ।

কুমারগঞ্জ থেকে বেরুবার সময় দাদার জ্বর ছিল অনেক। শিলিটা একা ছিল বাড়িতে। পরেশের এমন করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি।

খড়ের চালাটার বারান্দার এক কোণে বসে লালচে, মোটা কাচের গেলাসে, জল-মেশানো ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে ভাবছিল, পরেশ। ভাবছিল, এই জীবনে খুব কম কিছুই ও করেছে, যা, ওর করা উচিত ছিল। ছেলেবেলায় উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল আসামে, উত্তরবঙ্গ থেকে। তারপর এখানে এসেই এই বন-জঙ্গলের প্রেমে পড়ে গেল। শিকারের এক গুরুও পেয়েছিল, সে কাসেম মিঞা। এই নেশাটাই ধরে নিল তাকে কিশোর বয়সে। সেই যে ধরল হাত, বজ্রমুঠি আর ছাড়ল না। রাঙামাটি, পর্বত-জুয়ার, গঙ্গাধর নদী, রাইমানা, কচুগাঁও, বরবাধা, যমদুয়ার।

এই নেশা যাকে একবার ধরেছে, তার ইহকাল পরকাল সবই গেল।

ভুটানি মেয়েটার গাল দুটি কমলা লেবুরই মতন। বুকদুটি পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মতো দেখতে। ইচ্ছে করেই বুকের পর্দা একটুখানি খুলে রেখেছে। মাকাল ফল নির্গুণ হয়, কিন্তু এই ফলেব অনেকই গুণ। আর রূপ তো আছেই।

এখানে সব গণ্ডার-মারা, হাতি-মারা চোরা শিকারিরা আসে। স্মাগলাররা আসে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব চরিত্র। ভারতের দুটি রাজ্য এবং ভুটানের বর্ডার বলে নানারকম খারাপ কাজই হয় এখানে। মদ, আফিম, চরস, মেয়ে চালান যায়। মাঝে খুন-খারাপিও হয় দু-চারটে। রুক্ষ, দুর্দান্ত সব মানুষের গায়ের গন্ধ ভাসে এখানের বাতাসে এবং ভাসে বলেই এত ভালো লাগে পরেশের।

এক ঘণ্টার জন্যে ঘর বন্ধ করে কারও সঙ্গে বাঁশের মাচানে শুতে দু'টাকা নেয় মেয়েটা। বাইরে

যারা বসে মদ খায়, তারা দুটি সলিড-শরীরের, কখনো মৃদু, কখনো জোর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনতে পায়। হাঁসফাঁস নিশ্বাসের শব্দ, বাঁশের মাচার মচমচানি শব্দর সঙ্গে। সময় পেরুলে, জরায়ু ভিজলে; মেয়েটা ঘরের পেছনের জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে মস্ত মাটির জালাতে জল রাখা থাকে, একটা প্রাচীন শিমুল গাছের নীচে।

ধোওয়া-পাকলা করে নিয়ে, পরের রাউন্ড কুস্তীর জন্যে তৈরি হয় সেই পাহাড়ি মেয়ে। রতি-ক্রীড়ায় ক্লান্তিহীন এরা। যেমন, পাহাড় চড়ায়। চড়াই-উৎরাই সহজে পেরুতে জানে। তবে, কাজ কারবার যা হওয়ার, তা সন্ধে রাতেই শেষ হয়ে যায়। কখনো বা ভর দুপুরেও। যমদুয়ার, যমেরই দুয়ার। এখানে অন্ধকার নামার পর যম নিজেও ঘরের বাইরে বেরতে ভয় পায়। এ বড় ভীষণ বন। এই বনে যম নানারকম "ভেক" ধরে আসে। কখনো বাঘ, কখনো হাতি, কখনো দানো, কখনো বার্গম্যানের ছবি "দ্যা সেভেন্থ সীল"-এর দাবাড়ু মৃত্যুর মতো কালো পোশাক পরে।

খড়ের ঘরের বারান্দায় বসে, ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে, পরেশ সংকোশ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে, বন-বাংলোটা দেখা যায়। সূর্য ডুবতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। একটু পরেই মাচায় গিয়ে বসতে হবে ওদের। এইই ওদের জীবিকা। পেশা। ইচ্ছে করেই দুটি মাচা বেঁধেছে। একটি বড়, একটি ছোট। বড় মাচাতে বসবে ছাত্তার আর ক্যামেরন। আর অন্য গাছে, ছোট মাচাটিতে বসবে পরেশ একা।

বাঘ কিন্তু মারাতে হবে ওই ক্যামেরনকে দিয়েই। পরেশ কিংবা ছাত্তারের মতো শিকারির কাছে, বাঘ মারা কিছুই নয়। কিন্তু অন্য শিকারিকে দিয়ে বাঘ-মারানো বড় কঠিন কাজ। হাতে দামি বন্দুক-রাইফেল থাকলেই তো আর শিকারি হয় না কেউ। কত রকম, কত দিশি-বিদেশি, আর কত জাতের শিকারিই যে দেখল ওরা আজ অবধি।

পটাপট চারটে খেয়ে উঠল পরেশ। মেয়েটা খল-বল করছিল। মেয়েমানুষের দু-উরুর মাঝের আনন্দর স্বাদ পেতে তাকে কিশোর বয়সে একবার বাধ্য করেছিল পাড়াতুতো এক দশ বছরের বড় দিদি। ধর্ষিতা নারীদেরই মতন, সেও ধর্ষিত হবার পর থেকে ব্যাপারটাকে কোনোদিনও স্বাদু বলে মনে করতে পারে নি। প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট হয়েছিল ওর। তারপর থেকে এ ব্যাপারটার প্রতিই এক অসূয়া জন্মে গেছে পরেশের। পরেশ অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রচণ্ড নারী-বিদ্বেষীও। নারী সঙ্গর চেয়ে অনেকেই বেশি আনন্দ পায় নরেশ উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এসে থেকে।

মেয়েদের প্রতি ওর এই অনাসক্তি দেখে অনেকে ভাবে যে, ও নপুংসক। কিন্তু পরেশ নিজে জানে ও কী। কৈশোরের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের প্রতি ওর এক তীব্র বিদ্বেষ জন্মে গেছে। তাছাড়া, ওর ধারণা হয়েছে যে, মেয়েরা পুরুষকে পুরুষ হতে বাধাই দিয়েছে চিরটাকাল। শালা আদম যা করেছিল, তা করেছিল, আদম মূর্খ ছিল বলে পরেশ কেন মূর্খ হতে যাবে? যতটুকু দাম মেয়েদের প্রাপ্য ঠিক ততখানি দামই দেয় তাদের।

সেটুকুর এক কণাও বেশি দাম দিতে রাজি নয় ও।

ভুটানি মেয়েটা পরেশের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়। গতবছরও এসেছিল ওরা। তখনও হয়েছিল। মদ আর মেয়েমানুষ একসঙ্গে থাকলে, শুধু মদ দিয়ে সন্তুষ্ট কম পুরুষই থাকতে চায়। এমনই জেনে এসেছে মেয়েটি রূপোপজীবিনী হওয়ার দিন থেকে।

পরেশ অন্যরকম। পরেশ, কড়ায় গণ্ডায় নিজের ফেরত পয়সা বুঝে নিয়ে, মরা বিকেলের হলুদ আলোয় কমলা-রঙা মুখ ও বুকের ভুটানি মেয়েটির দিকে একবারও না তাকিয়ে মাচার দিকে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। ওর বন্দুক ও সঙ্গে করেই এনেছিল। যমদুয়ারে এসে একমুহূর্তও বন্দুকটা হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বন্দুকটা কাঁধের উপর ফেলে, দুটি হাত লাঠির মতো করে

শুইয়ে রাখা বন্দুকের উপর রেখে দিয়ে হাঁটে সে, ফিরে চলে বাথানের দিকে।

বেলা পড়ে এসেছে। ছায়ারা ঝুপড়ি হয়েছে। নিবাত নিষ্কম্প বন, ভরে উঠেছে নানারকম মিষ্ট-কটু-কষায় গন্ধে।

মাচার দিকে এগোতে দেখতে পেল পরেশ যে, ছাত্তার বনবাংলো থেকে জিপে করে ক্যামেরন সাহেব আর সেই পাঞ্জাবি মেয়েটিকে নিয়ে মাচার দিকেই আসছে।

মাচা অবধি এলে জিপের শব্দে বাঘ যেখানেই থাকুক হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। মাচা অবধি আসার মতো বোকামি ছাত্তার করবে না যে তা পরেশ জানত। পরেশ ভেবে পেল না যে, বড় বাঘ মারবে ক্যামেরন সাহেব, সঙ্গে ওই রিংকি নামের মেয়েটি কী করতে আসছে?

বাঘ-শিকার খেলা নয়! এমনকী মাচায় বসে, বাঘ শিকার দেখাটাও খেলা নয়। অনভিজ্ঞ বাক্যিবাগীশেরা অর্বাচীনের মতন যা খুশি বলতে পারেন। মাচাতে হেগে-মুতে দিতে দেখেছে কত বড় বড় শিকারিকে, শুধু বাঘ দেখেই! বাঘ ত শুধু একটা জানোয়ার মাত্র নয়। বহু শতাব্দীর রূপকথা, লোকগাথা, কুসংস্কার আর ভয়ের জীবন্ত প্রতীক। প্রকৃত বুনো বাঘ যখন প্রতিবারেই সামনে এসে দাঁড়ায়, স্যাংচুয়ারির বসে-খাওয়া, ঘাড়ে-গর্দানে-হওয়া বাঘেদের কুলাঙ্গারদের কথা বলছে না পরেশ, তখন বুকের মধ্যে, পেটের মধ্যে যে কী হয়, তা পরেশই জানে।

যে-সব আরাম-কেদারা-বাসী, কিতাব-দুরস্ত, সাহসী সমালোচক, মাচায় বসে বাঘমারা শিকারের মধ্যেই পড়ে না, এ কথা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন তাঁরা বনের বাঘকে তার স্বাভাবিকতায় কোনোদিনও দেখেন নি। স্যাংচুয়ারির বা চিড়িয়াখানার পোষা বাঘ নয়। জঙ্গলের আসল বাঘ। লজ্জাহীন মেয়েদের সব সৌন্দর্যই যেমন মাটি, পরাধীন এবং কোনোরকম ভয়ের কারণহীন বাঘেদের অস্তিত্বও তেমনই। ফাঁকা, মিথ্যে। তারা সত্যিই তাদের নিজ নিজ জাতের কুলাঙ্গার।

ভয়াবহতা না থাকলে, বাঘের বাঘত্বই লোপ পায়।

মাচা থেকে দুশো গজ দূরে ওদের নামিয়ে দিয়ে জিপ ফিরে গেল বাংলোতে। পরেশ কাছে গিয়ে দেখল, ক্যামেরন আর রিংকি দু'জনেই নেশাতে একেবারে চুর। ক্যামেরনের হাতে একটি হুইস্কির বোতল। সবুজ চৌকো দেখতে বোতলটা। নাম অ্যান্‌সেস্টর। রিংকি মেমসাহেব পিংক-রঙের একটি টাইট ব্লাউজ পরেছে, পিংক-রঙা স্কার্ট। ব্লাউজের তলাতে কিছু পরেনি। বোঝা যাচ্ছে। ওই শহুরে, ইংরিজি জানা মেয়ের, মোমের তালের মতো বুকের চেয়ে, একটু আগে দেখা ভুটানি মেয়ের পাকা মাকাল ফলের মতো শক্ত, লাল বুকের সৌন্দর্য অনেকই বেশি। যদিও মেয়েদের বুকের দিকে চোখ পড়লেই পরেশের গা-গোলায়, বমি-বমি পায়। তবু চোখ পড়ে গেল বলেই দেখল।

নারীরা নরকেরই কীট। ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীর সব মেয়েদের ও গুলি করে মেরে দিত। পুরুষদের এবং এই পৃথিবীর সমুহ সর্বনাশ করছে ওরা। ওদের প্রতি কোনো দুর্বলতাই নেই পরেশের।

ছাত্তার বলল, পরেশকে, সাহেবদের সঙ্গে তুইই বোস পরেশ, বড় মাচাতে।

পরেশ তীব্র আপত্তি জানাল।

ওর বমিই হয়ে যাবে। কোনো মেয়ের শরীরের অত কাছে থাকলে, ঘেন্নাতেই ওর বমি হয়ে যাবে। কিন্তু ছাত্তার নাছোড়বান্দা। তাছাড়া, ছাত্তারই তাকে সঙ্গে করে এনেছে। শিকারে কাউকে না কাউকে নেতা বলে মেনে নিতেই হয়। শুধু শিকার কেন, সমস্ত মারণযজ্ঞেই নেতার ভূমিকা থাকেই। সবাই যেখানে নেতা, সেখানে মারামারিটা প্রায়ই নিজেদের মধ্যেই ঘটে যায়।

অতএব ক্যামেরন এবং রিংকি মেমসাহেবের টলমল পায়ে মাচার ওঠার পরেই পরেশকেও উঠতে হল। রিংকি-মেমসাহেব যখন উঠছিল মাচাতে, দড়ি-দিয়ে বানানো সিঁড়ি বেয়ে দুলতে দুলতে, তখন

নিচে-দাঁড়ান পরেশ তার গোলাপি স্কার্টের ফাঁকে তার গোলাপি উরু এবং নিতম্বর আভা দেখেছিল। তখন সংকোশ নদীতেও শেষ সূর্যের গোলাপি আভা। রিংকি-মেমসাহেব স্কাটের নীচেও কিছু পরে নেই, বুঝেছিল পরেশ।

ওই উরুর আভা দেখার পরমুহূর্ত থেকেই পরেশের বুকের মধ্যে একধরনের কষ্ট শুরু হল। সেই কষ্টর কথা ও আগে কোনোদিনও জানেনি। সে কষ্টটা, মেয়েদের প্রতি বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে তোলা, ওর তীব্র ঘৃণার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র কষ্ট। সে কষ্টের নাম ও জানে না। তাকে আগে জানেনি কখনো। এই কষ্ট নিশ্চয়ই কোনো রিপুজাত। সেই রিপুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না আগে।

সত্যিই বড় কষ্ট হতে লাগল পরেশের।

বাঘটার আসার কথা, ভুটান পাহাড়ের দিক থেকে। পায়ের দাগ তাইই বলে। এমন গহন জঙ্গলে বেলা থাকতেই বাঘ এসে হাজির হওয়ার কথা। বিশেষ করে, আগের রাতের শেষে করা মড়ি। খেয়েও গেছে একটুখানি। অতএব...।

সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু পশ্চিমাকাশে গোলাপি আভা আছে এখনও। সংকোশ নদীর বুকে যে নুড়িময় চর জেগেছে, এখন সেখানে একদল গোলাপি-মাথা বিদেশি হাঁস আর হাঁসী স্বগতোক্তি করছে, দিনশেষের আগে। তাদের ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে। মাচার উপরের এই গোলাপি শরীরের হাঁসীটিরই মতো, রিংকি।

ঝিঁঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে। সন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বনের গভীরে আলো মরে যাওয়ার দুঃখে যে রুদ্ধশ্বাস শোক পালিত হয় কয়েক মুহূর্ত; প্রাণী, পশু, পাখি, গাছ-পালা যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ, সেই মুহূর্তটিতেই এসে দাঁড়িয়েছে এখন দিন। এই মুহূর্ত পেরলেই রাত নামবে।

ক্যামেরন আর রিংকি বোতলটা থেকে ক্রমাগত খেয়েই চলেছে। খেয়ে, পরেশের উপস্থিতিতেই এমন এমন কাণ্ড করছে যে, পরেশের মনে হচ্ছে, ওরা যেন তাকেও কোনো পাথর বা গাছ বা ফুল বলে মনে করছে। মানুষ ত দূরের কথা গাছেরাও যে দেখতে পায়, তা কি ওরা জানে না! আর পরেশ তো মানুষই। জলজ্যান্ত শক্ত সমর্থ একজন মানুষ।

অন্য দিন হলে, ও ঘৃণাতে মুখ ফিরিয়েই থাকত কিন্তু আজকের এই নতুন অনুভূতি ওকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছে না। ও যত ওই সব দেখছে, যতই বুঝছে যে, মাতাল বুড়োর দাঁতহীন কামড়ে এই যুবতী মেয়ের ছটফটানি যতই বেড়ে যাচ্ছে, ততই সেই ছটফটানিটা যেন পরেশের ভিতরে চারিয়ে যাচ্ছে।

আজকে কিছু একটা ঘটবে।

পরেশ নিজেকে বলল। মনে মনে। সত্যিই সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। বাঘ শিকারে এসে আজ নিজেই শিকার হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ বছরের পরেশ। জঙ্গলের সব কিছুই ও জানে চেনে। এই নতুন গোলাপি মেয়ে জানোয়ারের দাঁত নখ-এর খবরই শুধু জানা নেই ওর। কীভাবে আক্রমণ করে তাও জানা নেই। আক্রমণ প্রতিহত করার প্রক্রিয়াও নয়।

অন্ধকার হওয়ার পরই বাঘটা ডাকল একবার। আশ্চর্য! বাথানের দিক থেকেই। মোষগুলো যে বাথানের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করছে তা এতদূরে বসেও শোনা গেল।

আশ্চর্য তো! বাঘটা কাল রাতে মড়ি করেছে, আসবেও এখানেই। তবুও মোষেদের বাথানের কাছে একবার না গিয়ে পারল না।

পরেশের মনে হল, রোজই একবার করে ভয় দেখিয়ে যায় সম্ভবত বাঘটা, বাথানে মোষেদের

উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে। কুমারগঞ্জের মুদির দোকানি মধুদা যেমন রোজই ধার-দেওয়া বন্ধ করে দেবে বলে ভয়ে খাবি-খাওয়ায় পরেশকে। নখ-দন্তওয়ালা জানোয়ার আসলে শহরে-গঞ্জেই বেশি আছে জঙ্গলের চেয়ে। মধুদার মতো, ক্যামেরন সাহেবের মতো। তবে ওদের দাঁত-নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিলেও রক্ত পড়ে না। এই যা তফাত।

অনেকের দাঁত-নখে সত্যি ধারও থাকে না, যেমন ক্যামেরনের। কিন্তু তবুও দাঁত-নখ দেখিয়েই তারা সহজে কাজ হাসিল করে। আলমারিতে, ব্যাঙ্কে, তাকের পর তাক তাদের দাঁত-নখ সাজানো থাকে। কাগজে-ছাপা নখ, রুপোর দাঁত, সোনার থাবা। পরেশ জানে। জানে বলেই, বাঘের চেয়ে এদের অনেকেই বেশি ভয় করে ওর। বাঘের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ তো জানাই। কিন্তু এদের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ জানা যায় না। সব শিকারেরই নিয়মকানুন থাকে। শিকারি এবং এমনকী শিকাররাও সেই অলিখিত নিয়মকে মেনে চলেই। কিন্তু এই সব শিকারিরা কোনো নিয়ম, কোনো বিবেকেরই ধার ধারে না।

ঘনান্ধকার নেমে এসেছে এখন। জঙ্গলের চন্দ্রাতপের নীচে অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। রাত পাখিরা ডাকছে থেকে থেকে। অনেক পাখি। ছাত্তার ওদের সকলের নামই জানে। পরেশ ডাকগুলো চেনে; কিন্তু নাম জানে না।

বাথানের কাছ থেকে সেই যে ডেকেছিল বাঘ, সেই ডাক থেমে গেছে অনেকক্ষণ। এবারে সে বোধহয় মড়ির কাছাকাছিই এসে গেছে। খুবই সন্তর্পণে আসবে। চারদিক দেখে নেবে। অসম্ভব না হলে, গোল করে চক্কর মারবে চারদিকে। তারপর মড়ির কাছে কোনো বিপদ যে নেই, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেই মড়িতে আসবে। সন্দেহ যদি একটুও হয়, তাহলে সে ফ্রিজ করে যাবে, সিনেমার শট-এর মতন। নাম বাঘ। তার ধৈর্যর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। একই জায়গাতে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে হয়তো, মাচার কাছেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ছায়ার সঙ্গে মিশে থাকবে। ও জানোয়ারের চরিত্রে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। পৃথিবীর সবটুকু সময়কে তার থাবার নীচে নিয়ে বসে থাকে সে। হঠকারিতা তার চরিত্রেই নেই।

সেই কারণেই বাঘে-করা মড়ির উপরে ধ্যানে-বসা মুনি-ঋষিদেরই মতো নীরব, নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকতে হয় শিকারিকে। কিন্তু পরেশের মাচায় যে সব কাণ্ড-মাণ্ড চলছে—হি-হি-হা-হা, উঃ-উঃ-ইঃ-ইঃ-ইঃ, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি, ফুঁ, তার বিচিত্র আওয়াজে বাঘ তো দূরস্থান বন বেড়ালও মাচার এক মাইলের মধ্যে আসবে বলে মনে হচ্ছে না আজ রাতে।

ছাত্তারকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবে কোনোই সাড়াশব্দই নেই ছাত্তারের মাচা থেকে। কী করছে সে ভূতের মতন নিঃশব্দ নিঃসাড় হয়ে, তা সেই জানে। সেও আজ বাঘ হয়ে গেছে।

ছাত্তার আধ ঘণ্টাটাক পরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই পরেশ। এই হারামজাদা কি বাঘ মাইরবার লইগ্যা আইছে যমদুয়ারে? না লদকা লদকির লইগ্যা? যে জিনিস খাটে শুইয়াই করন যায়, তা করনের লইগ্যা সেগুন গাছের মাচার কী কাম বুঝি না। চল্ চল্। লাম্। ফিইর‍্যা যাই চল্। কী খিটক্যাল। কী খিটক্যাল। ওই বুড়ার মাগ্যে আমিই গুলি করুম আজ। দেইখ্যা লইস তুই। হালায় হারামির পুত।

পরেশকে মাচা থেকে নামতে দেখেই ক্যামেরন হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, হামারা টাইগার কঁহা? টাইগার?

ছাত্তার তার মাচা থেকে নামতে নামতে, নিজস্ব ভাষায় নিজের মনেই বলল, ওই ম্যামছাহাবের দুই ঠ্যাঙের ফাঁকে ভালো করি দ্যাখবার কয়্যা দে পরেশ, হারামি ছাহেবরে। বাঘ মারন লাগব না আর। তার বাঘ সেখানেই শুইয়া আছে। এ হালার লাইনই ভিন্ন। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। টঙে বইস্যা।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ পরেশের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। এক বিচ্ছিরী দৃশ্য। তায়, এত বিচ্ছিরী করে তার বর্ণনা দেওয়া।

পরেশ আসলে কবি। প্রকৃতিপ্রেমিক। ওর সূক্ষ্ম রুচিতে বড় ধাক্কা লাগল।

গাছ থেকে নেমেই ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল পরেশ। পরেশ আবার পুরোনো পরেশ হয়ে গেল। ছাত্তারই তাকে ফিরিয়ে আনল ওই রকম বর্ণনা দিয়ে। ভালোই হল। পরেশ যা নয়, তাই হতে যাচ্ছিল। পরেশ যা ছিল, তাই হতে পেরে; খুশি হল খুব। প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষ আবার স্বাভাবিক করে তুলল তাকে।

ক্যামেরন, রাইফেল তুলল মাচাতে বসেই পরেশের দিকে। বলল, "কাম আপ উ্য সান্ অফ আ বিচ্। হোয়্যারস্ মাই টাইগার?"

ছাত্তার ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরেশের।

সে মুখ তুলে বলল, ম্যামসাহেবের ঠ্যাঙের ফাঁকে তর বাঘ আছে হারামির পুত্। বড় বাঘ মারতে আইছে হালায়।

ক্যামেরন রাইফেলের নল তুলল ওদের দিকে।

মাতালের ঠিক নেই। সব মাতালের তাল ঠিক থাকে না। কী করতে কী করে বসে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্তার তার বন্দুক তুলে গুলি করল ওদের দিকে। গুলি BALL ছিল। সেটা গিয়ে গাছের কাণ্ডে লাগল ক্যামেরনের মাথার এক হাত উপরে। ছাত্তার যেখানে মারতে চেয়েছিল, সেখানেই লাগল।

রিংকি আর্তনাদ করে উঠল। ক্যামেরনও। পরক্ষণেই ক্যামেরন গুলি করল রাইফেল দিয়ে। গুলিটা ওদের তিনহাত বাঁ দিকে, শালের চারাগাছে পড়ল। মাটি ভেদ করে গেল।

রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ গম-গম করে ফিবে এল ভুটান পাহাড় থেকে।

ছাত্তার বলল, চল পরেশ, পালাই। এ হালার মাতালের ঠিক নাই। তায়, হাতে আবার ম্যাগাজিন রাইফেল। যদি গুলি লাইগ্যা যায় আন্দাজে। কওন ত যায় না। কপাল যখন খারাপ হয়, তহন...

ওরা এঁকে-বেঁকে দৌড়তে লাগল বাংলোর দিকে।

দৌড়তে দৌড়তে ছাত্তার বলল, হালার পুত্ এর নিশানাখানা দ্যাখছস। মাচার এক্করে নীচে খাড়াইয়া ছিলাম, তাই আমাগো তিনহাত বাঁয়ে ফ্যালাইল রাইফেলের গুলিখানরে। হালায় বড় বাঘ মারে! খাউক্! খাইয়া ফ্যালাক হালারে বাঘে। খুবই খুশি হমু আনে।

এখন কী করবে ছাত্তার! তুমি যে ওই গুলিটা ওকে ভয় পাওয়াবার জন্যেই করেছিলে, তাতো ও বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে বলবে, আমরা ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

পরেশ, চিন্তার গলায় বলল।

কউক না। যদি থানায় যায়, হালারে সত্যিই আমি জানে মাইরা থুমু।

তাতো! কিন্তু এখন কী করবে?

এখন চল্, জিপ চইড়্যা একটু হাওয়া খাইয়া আসি।

যাইবা কই?

রাইমানায় চল। বড়ই রসগোল্লা খাওনের ইচ্ছা করতাছে আমার।

পাগল হইল্যা নাকি তুমি মিঞা?

পাগল ক্যান হমু? জিপ লইয়া আমরা ঘুইর‍্যা-ফিইর‍্যা শ্যাষ রাতে মাচার কাছে ফিইর‍্যা যামু। ওই হালার ক্যামেরনের সাধ্য আছে নাকি এই জঙ্গলে মাচা থিক্যা নাইম্যা ওই মাইয়ারে সঙ্গে লইয়া বাংলোয় ফিরনের? ভয়েই মইর‍্যা থাকবোআনে পথে। যতক্ষণ আমরা না যামু, ততক্ষণই হালার শাস্তি।

লাভ কি অইলো? বাঘ তো মারা হইলো না। টাকাটাত দিব না। শুদামুদা হয়রানি।

থামতো। বাঘ মারতে কী লাগে? ওর লইগ্যা মারলে মারুম। যদি হালায় টাকা দ্যায়। নইলে বাঘ এমনিই মাইর‍্যা, চামড়া বেইচ্যা দিমু আনে লহর শেখরে। ধুবড়িতে। চইল্যা যাইবো গিয়া সে চামড়া, গৌহাটি। আমেরিকানরা বহুতই দামে লইয়া যাইবো গিয়া। যে টাকা, ওই ক্যামেরনে দিত, চাম্ বিক্রি কইর‍্যা তার থিক্যা অনেকই বেশি পামুনে। টাকা টাকা করস্ ক্যান্? আমরা কি ভিখারি? যদ্দিন হাতে বন্দুক আছে, তদ্দিন না-খাইয়া মরুম না। শুনছস? কান খুইল্যা শুইন্যা রাখ।

হ, পরেশ বলল, মাথা নীচু করে।

বাংলোতে পৌঁছেই দেখল, ড্রাইভার উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারও ধুবড়ির। সাহেবতো ভাড়ায় এনেছে জিপ, ধুবড়ি থেকে। ড্রাইভার আনসারকে বলল ছাত্তার, চলরে আনছার ভাই, রসগোল্লা খাইয়া আসি।

ড্রাইভার আনসার বলল, চিন্তিত গলাতে, সাহেব যদি ভাড়া-মাড়া লইয়্যা গোলমাল করে? ও ছাত্তার ভাই। পরে সামলাইব কেডায়?

ছাড়ান দে তো। ওর পেণ্টুলুন খুইল্যা ফ্যালাইম্যু না। মাগিটারে রাইখ্যা দিমু অনে। তারপর নেপালিগো বাথানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুম। এক্কেরে ঘিই-বানাইয়া থুইবো তারা অরে। ওই সব পিঁয়াজি আমার থনে মারন লাগবো না। আমার নাম আবু ছাত্তার। হালার ক্যামেরনের কি চিনন বাকি আছে নাকি আর আমার? মুই ভালোর সঙ্গি ভালো, খারাপের সঙ্গি যম। হঃ। হালায় ভালো কইর‍্যাই জানে তা। কুনোই চিন্তা নাই তগো। চল চল, রসগোল্লার লইগ্যা মনটা হাঁচোর-পাঁচোর করতাছে।

খুব জোরে জিপ চালিয়ে আনসার যখন রাইমানাতে পৌঁছল, রাইমানার ছোট্ট মিষ্টির দোকানের মালিক, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে, বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় করছিল।

ঠিক সময়েই ওরা গিয়ে হাজির। রসগোল্লা গরমই নেমেছিল সবে।

আনসার বলল, যা হইল্যো তা ভালোরই জন্য। মোর প্যাটটা নরম হয়্যা ছিল সকাল থিক্যা। ধইর‍্যা যাইব গিয়া গরম রসগোল্লা খায়্যা।

দোকানের মালিক ঘাঁটু বলল ছাত্তারকে, খান খান যতগুলা খুশি খান। পয়সা কিন্তু নিমু না।

ক্যান? পয়সা নিবি না ক্যান? আমরা কি তোর কুটুম?

কুটুম না অইলে হয় কী! সেই মাঘ মাসে আইছিলেন না ছাত্তারদা। যা হরিণের মাংস খাওয়াইছিলেন, কী কম্ম্য। আমার বউ তো কয়, মুখে লাইগ্যা আছে এহনো। এবারে কী হইল শিকার? কারে লইয়া আইছেন?

পরেশের মুখটা চিরদিনই খারাপ।

বলল, এবারে যা শিকার হইতাছে তা খাইলে তোমার প্যাটও নরম হইয়া যাইব গিয়া ঘাঁটু, আনসারেরই মতন। সব খাদ্য, সব শিকার; খাইতে পারে কি হক্কলে? ত্যামন ত্যামন খাদ্যর লইগ্যা, ত্যামন ত্যামন প্যাটের দরকার।

ঘাঁটু কথার মানে না বুঝে, হাঁ করে চেয়ে রইল পরেশের মুখে।

ছাত্তার মুখভরা রসগোল্লা নিয়ে মুখ-বন্ধ-করা অবস্থাতেই ফিচিক্-ফিচিক্ করে হাসতে লাগল।

এমন সময় বাসটা এল। শেষ বাস। জানলার খড়খড়ি খড়খড়িয়ে গ্যাটিস লাগানো টায়ারে ভটর-ভটর আর ঢিলে বনেটে ঝ্যাকর্-ঝ্যাকর্ শব্দ করে, পেট্রোল-ট্যাঙ্কের মুখ থেকে উপছে-পড়া পেট্রোলের তীব্র মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে।

বাসটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভার, বয়স-হয়ে-যাওয়া বাঈজির পেল্লাই মাই-এর মতো চামড়া ফাটা-ফাটা বালব-হর্নটি জম্পেস করে ধরে, তিনবার টিপল, প্যাঁকু-প্যাঁকু-প্যাঁকু।

রওয়ানা হবে আবার উলটো পথে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নির্জন পথ। প্যাসেঞ্জার বেশি থাকলে সাহস হয়। এই দিকে নেই, এমন জানোয়ারও তো নেই।

বাসটার দিকে চেয়ে থেকে রসগোল্লা খেতে খেতে হঠাৎই পরেশ উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। ঘটি চেয়ে, হাতটা পথে ধুয়েই বলল, ছাত্তার ভাই, আমি চলি। ডাক আইছে আমার। দাদায় আমারে ডাকে। তুমি ওই ম্যামসাহেব আর বুড়ারে সামলাইওনে।

ছাত্তার ভুরু তুলে তাকাল একবার ওর দিকে।

পরেশ ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে দোকান ছেড়ে, ড্রাইভারের পাশের ভালো সীটে বসবে বলে। বাসের ড্রাইভারও বন্দুক-কাঁধে পরেশ শিকারিকে দেখে খুশি হল। এই রাস্তায়, সঙ্গে শিকারি থাকলে বুকে বল লাগে। বড় বাঘ, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায়ই হুঁয়াও-হুঁয়াও করে।

ড্রাইভার বলল, আজ কিন্তু তামাহাটেই থাকন লাগব পরেশদা। বাস তো ওই অবধিই যাইব।

তুই থাকবি কই?

আমি তো গুলাবচাঁদজীর গদি ঘরে শুইয়া থাকুম। বারান্দায় খাটিয়া টাইন্যা লইয়া। গরমের দিনে শোওনের চিন্তাডা কী?

আর খাওন-দাওন?

গুলাবচাঁদজীর শেঠানি পুরি তরকারি দিবে অনে। ফুট-ফরমাস্ খাইট্যা দি না কত্ত? ধুবড়িতে পুর্চা পৌঁছাইয়া দ্যাও, কচুগাঁতে মাইয়ার বাড়ি আঁচার পৌঁছাইয়া দ্যাও, কারিপাতা গাছ থিক্যা পাতা ছিইড়া য়্যানো বন খুঁইজা। খাওইবনা ক্যান্? ভাবনা কী? আপনেও খাইবেননানে আমার লগে।

নাঃ। আমি মনা মিত্তিরের বাড়ি চইল্যা যামু।

মনা মিত্তির নাই। ধুবড়ি গ্যাছেন গিয়া।

বাচ্চু আর পাঁচুতো থাকব। মানিকদায়, গল্প করে ভারি মজার মজার। কী ও পাঁচু?

হঃ। যা কইছেন পরেশদা। ওয়ার-রিটার্ন মানুষগুলানের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কী কন?

হ। একসপিরিয়েন্স-এর দাম নাই? পুরুষ মানুষে যদি দুনিয়াই না দ্যাখল, তয় কইরবার মতো কইরলোটা কী?

আনসার অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। মানে, বাসটার দিকে। পরেশের কম্বল, সুজনি, বালিশ সব পড়ে আছে নেপালিদের বাথানেই। জঙ্গলে তখনও রাতে বেশ ঠান্ডা। লোকটা বলা নেই, কওয়া নেই অমন হুট করে চলে গেল! আরও অবাক হল ও, ছাত্তার ভাইও ওকে কিছুই বলছে না বলে।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তারও হাত ধুয়ে বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরেশকে বলল, ফিবনের পথে কুমারগঞ্জে তর সাথে দেখা কইর‍্যা যামু আনে।

দেখি, কী হয়।

যা হয় অইব। তোমারে কি অবিশ্বাস করি আমি?

না। সে কথা...

ঠিক আছে।

যাই।

যাওন নাই। আসো।

জিপটা চলে গেল। একটু গিয়েই, বন বিভাগের চেক-নাকাটা পেরিয়েই, টপ-গিয়ারে ফেলে, হেডলাইটটা ডিপার করে দিল আনসার। তারপর গভীর বনের মধ্যের রাস্তায় জিপের স্পিড বাড়িয়ে বলল, অদ্ভুত মানুষ এই পরেশদা। না, ছাত্তার ভাই।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তার মুখে গুয়া পান দিয়েছিল।

বলল, সব মানুষই অদ্ভুত। মানষের ছা তো আর জানোয়ারের ছা লয় যে, একইরকম অইব। আমাগো পরেশ হইলো গিয়া পোয়েট। ভাবুক। যখন ওর যা মুড হয়, বাবু ঠিক তখনই তাই করেন। আমারও খুব ইচ্ছা যায়, পরেশ হইয়া যাই। কিন্তু ঘরে বিবি আছে, পোলা-পান; ক্ষুধা; এইটা চাই, ওইটা চাই। এই জীবনে যহন যা ইচ্ছা করে, তাইই করনের মতো কঠিন কাম আর কিছু নাই রে আনসার। আমরা পারি না, পারি নাই; পরেশ পারছে। লোকে ওরে ভ্যাগাবন্ড, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লোফার কয়। কয় তো কয়। হ্যাতে পরেশের কিছুই যায়-আসে না। নিজের জীবনের স্টিয়ারিং ওর নিজেরই হাতে। আমাগো মতন বেড়ি লাই অর দ্যাখ, তুই জিপ চালাইতাছস আর আমি বইস্যা আছি তোর পাশে।

নিজের জীবনের গাড়ি নিজে চালাইতে না জানলে শুদামুদা বাঁইচ্যা কোনোই লাভ নাই।

লোক ভরে যেতেই, বাসটাও ছেড়ে দিল।

পরেশ, ড্রাইভারের পাশে বসে ভাবছিল, দাদার অসুখের কথা মনে পড়াতেই যে ও ফিরে যাচ্ছে; শুধু তা নয়। তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল।

ওই রিংকি মেয়েটার শরীর ওর সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এমন যন্ত্রণা ও কখনো ভোগ করেনি। মেয়েরা হল গিয়ে পুরুষের শত্রু। ওদের ওই শরীরের মধ্যে জাদু আছে। পুরুষ হল, বহির্মুখী জীব। বনে পাহাড়ে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ানোই তার কাছে জীবনের সব। ওই মেয়েটা তাকে বন্দি করতে চেয়েছিল, না চেয়েই। অনেক বিপদের হাত থেকে বেঁচে সে এই পঁয়ত্রিশ বছর পথ পেরিয়ে এসেছে। ওই লোভের পথে পা বাড়াবে না বলে, নিজের ভিতরে এই মেয়ে জাতটার প্রতি এক গভীর ঘৃণা জমিয়ে তুলেছে ও। সংসার, ছেলে-মেয়ে, রান্না-বান্না, অসুখ-বিসুখ এ সব সে দাদার পরিবারে থেকেও জেনেছে। উপর উপর দাদার জন্যে বউদির জন্যে যতটুকু পেরেছে, করেছে। টাকা পয়সা, তার যা দেয়, তার থেকেও বেশি দিয়েছে চিরদিন। কোনো গদিতে থাকলে ওর চেয়ে কম খরচে ওর চলে যেত দিন। বিবেকের কারণেই পারেনি। তবে নিজের সংসার করার মতো মূর্খামি এতখানি পথ পেরিয়ে এসে সে করতে রাজি নয়। তাছাড়া ও মেয়ে তো সংসারের মেয়ে নয়। বাজারের মেয়ে। যাদের নষ্ট করার মতো অঢেল টাকা আছে ক্যামেরনের মতো, তারাই পারে ওরকম বাজারি মেয়ের সঙ্গে বাজার করতে। ওই সব মেয়ের ধর্মই পুরুষকে নষ্ট করা। যার ঘর আছে, তার ঘর ভাঙা। যার ঘর নেই, তাকে ঘরের মিথ্যা স্বপ্ন দেখানো। বেঁচে থাকলে, শিকার অনেকই করবে, টাকাও রোজগার করবে শিকার করে। মানে মানে প্রাণ নিয়ে, তার স্বাধীনতা নিয়ে, সে তাই পালিয়ে এসেছে।

পরেশ ভাবছিল, তার শরীরটা তার সঙ্গে এ প্রথম বেইমানি করল। তার শরীর মধ্যে এত হাজার কাঁকড়া ঘুমিয়ে ছিল, তাদের দাঁড়ার কামড় যে এমনই ভীষণ; তা আগে কখনো জানেনি ও। খোলা হাওয়ায় শেষ চৈত্রর বনের রাতের গন্ধে, পরেশের মন আবার খুশিতে ভরে উঠেছে।

ড্রাইভার বলল, বিড়ি খাবা না কি একটা পরেশদা?

দ্যাও।

বলে, পরেশ হাত বাড়াল।

তারপর বিড়িটা, হাওয়া আড়াল করে ধরিয়ে, জোর ধোঁয়া ছাড়ল এক বুক।

আঃ। শান্তি; বড় শান্তি। বড় আনন্দ এই আগল-খোলা, বাঁধন-হারা জীবনে। এই শান্তির কথা ঘরে ঘরে নিজের নিজের বউ নিয়ে জাবর-কাটা, খোঁটায়-বাঁধা পুরুষেরা কল্পনাও করতে পারে না।

শিলি নদীতে চান করতে গেছিল আজ। বহুদিন পরে।

পাশের বাড়ির মুনিয়াও গেছিল সঙ্গে। ও বলল, বাড়িতে অনেক কাজ। তাই তাড়াতাড়ি চান সেরে উঠে চলে গেছে আজ ও।

রোজ তো বাড়িতে চান করে। তোলা কুঁয়োর জলে, ঘেরা বাথরুমে। সপ্তাহে একবার করে আসে নদীতে। ভালো করে পা ঘষে, মাথা ঘষে, সঙ্গে কেউ থাকলে, তাকে বলে পিঠে সাবান দিয়ে দিতে। তারপর অনেকক্ষণ সাঁতার কাটে। নদীর স্রোত তার উলঙ্গ শরীরের আনাচে-কানাচে বয়ে যায়। অননুভূত অনুভূতিতে সারা শরীর আরামে আবেশে ভরে যায়। জলের যে কত সহস্র হাত, আঙুল তা যারা নদীতে অবগাহন না করেছে তারা জানে না। তার শরীরের গোপন, অসূর্যম্পশ্যা জায়গাগুলি সেই সব আঙুলের আদরে শিরশির করে ওঠে। ভালোলাগায় মরে যায় শিলি। কত কী কল্পনা করে সেই সব মুহূর্তে, কত সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে। যে-সব স্বপ্ন, শিশুকালের পুতুল খেলার দিন থেকে প্রত্যেক মেয়েই বুকে করে বড় হয়; সেই সব স্বপ্নই জলের তলায়, দুপুরের নিরিবিলিতে সত্যি হয়ে উঠতে থাকে এক এক করে।

মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকে জলের তলায় চোখ খুলে। জলের নীচের হলদেটে সবজে আলো প্রতিসরিত হয়ে গিয়ে তার দু'চোখের মধ্যে দিয়ে তার মস্তিষ্কের ভিতর নানা নরম রঙ ছড়িয়ে দেয়।

দুপুরের এই সময়টা নদীপারে কেউই থাকে না। কোনো নৌকোও এই সময় থাকে না নদীতে। জোয়ারভাটা দেখেই ওরা তরী বায়। সকালে জোয়ারে ভেসে যায়, বিকেলে ভাটায় ফেরে।

শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ সব নদীপারের একটি ঝোপের উপরে খুলে রেখে এসেছিল। চান করে যে নতুন শাড়ি পরবে, তাও। যখনই আসে, তখন এমনই করে।

জলে অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পর যখন তার হাত পায়ের আঙুল, মুখের চামড়া ঢেউ-খেলানো হয়ে গেল, শরীরে নদীর সব স্নিগ্ধতা বসে গেল, তখনই শুধু নদী ছেড়ে উঠল ও। জল ছেড়ে নগ্ন, রোদ-পিছলানো শরীরে ও যখন ঘুঘু-ডাকা নদীপারে উঠে আসে জল ঝরাতে ঝরাতে, তখন প্রতিবারেই ওর মনে হয়, ও যেন কোনো জলকন্যা। জলের নীচের কোনো প্রাসাদেই বুঝি ওর বাস। মাটির কোনো রাজপুত্রর দেখা পাবে বলেই যেন ও মাঝে মাঝে এই মাটির, গাছ-গাছালির, পাখ-পাখালির পৃথিবীতে উঠে আসে।

ঝোপটার কাছে তখনও ও এসে পৌঁছোয়নি এমন সময় একটা মাদার গাছের ঝুপড়ি ডাল থেকে কে যেন মোটা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল, শিলি।

চমকে উঠে, প্রথমেই দু হাত দিয়ে বুক আড়াল করল শিলি। পরমুহূর্তেই বুক খোলা রেখে ও উরুসন্ধি ঢাকল দু হাতে। মেয়েদের শরীরের কোন জায়গাটা যে বেশি গোপন, পরকে দেখানোতে বেশি লজ্জা; তা বুঝি ক্ষণেকের জন্যে বুঝে উঠতে পারে না ও।

ততক্ষণে গদাই ঝুপ্ করে গাছ থেকে লাফিয়ে নামে। একটা নীল রঙা টুইলের শার্ট ওর গায়ে। মিলের ফাইন ধুতি। সে শিলির দিকে দৌড়ে এসে যে-ঝোপে ওর শাড়িটাড়ি ছিল, সেই ঝোপটার আর শিলির মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর চোখেমুখে মুগ্ধ, লুব্ধ দৃষ্টি। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, একটিবার হাত সরা শিলি। তোকে একবার দেখি ভালো করে।

শিলি গর্জে উঠে বলে, অসভ্য। জানোয়ার। দাঁড়াও। কাকাকে বলে দেব। কাকা তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

সরল শিশুর মতো মনের গদাই বলে, শুধু একটু দেখতে চাওয়ার জন্যে পরেশ কাকু গুলি করে মারবে আমাকে? তুই বড় কৃপণরে শিলি! যা নদী দেখল, মাছ দেখল, দেখল জলের শুশুক, এত

বড় আকাশ যা দেখল, দেখল এত এত গাছ আর পাখি, দেখল আকাশ-ভরা রোদ, তাই দেখতে চাওয়ায় এতবড় শাস্তি আমার?

একবার দেখতে দে শিলি। তোর পায়ে পড়ি।

গদাইকে অপ্রকৃতিস্থ দেখাল।

শিলি, এক ধাক্কায় গদাইকে সরিয়ে দিয়ে শাড়ি, জামা সব তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল কোনো নিরাপদ আড়ালে গিয়ে ওগুলো পরে নেবে বলে।

আশ্চর্য! গদাই তার পেছনে পেছনে এল না। কোনোরকম অসভ্যতা করল না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল শিলির দিকে। জল-ভেজা ছিপছিপে কালো, লাফিয়ে-ওঠা শিঙ্গি মাছের গায়ে রোদ পড়লে যেমন চেকনাই ওড়ে, তেমন চেকনাই উড়ল দৌড়ে যাওয়া উলঙ্গ জল-ভেজা শিলির উড়াল শরীর থেকে। পেছনটাও কী সুন্দর। মনে মনে বলল, গদাই। তারপর স্তব্ধ, মুগ্ধ চোখে গদাই চেয়ে রইল, যেদিকে শিলি গেল।

গদাইও কবি। পরেশেরই মতো। একজন নারী-প্রেমী কবি। অন্যজন নারী-বিদ্বেষী।

গদাই ভাবে, কবি এই দুনিয়ার সকলেই। কেউ কাগজে কবিতা লেখে, কেউ মনে মনে। কেউ কবিতা পাঠায় সম্পাদকের দপ্তরে, কেউ মাকাল গাছের পাতা ছিঁড়ে অদৃশ্য মনের কালিতে সেই গোপন গা-শিউরানো কবিতা লিখে ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। কবিতার যে অনুপ্রেরণা, তারই উদ্দেশ্যে, নৈবেদ্যর মতো। বিজয়া দশমীর দিনে পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে প্রদীপ ভাসায় যে মেয়েরা, তারাও গদাই-এরই মতো কবিতাই লেখে, প্রদীপের আগুন-রঙা কালি দিয়ে জলের কাগজে। ভাবছিল গদাই।

সবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে-যাওয়া শিলির দিকে শুভকামনা, মুগ্ধতা, নীরব স্তুতিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে গদাই, অনেকক্ষণ। নদীর ওপার থেকে উড়ে-আসা শঙ্খচিল ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় শিলির মাথার ওপর দিয়ে। বহুদূর থেকে নিঃশব্দে গুণ টেনে বাদামি পাল তোলা নৌকোকে স্রোতের মুখে আসতে দেখা যায়। আঁৎকে ওঠে শিলি। আজ বড় বেশিক্ষণ জলে ছিল! নইলে নৌকো আসার সময় ত এ নয়।

গদাইও মনে মনে গুণ টানে। বাদামি পাল তুলে দেয় তার মনের নৌকোয়। জোরে হাওয়া এসে লাগে তাতে। যে হাওয়াতে জল-ভেজা শিলির নগ্নতার গন্ধ, সেই হাওয়া নাকে নিয়েই ভালোলাগায় মরে যায় গদাই।

তারপর গদাই-লশকরি চালে, বাড়ির দিকে হাঁটে। গদাই মনে মনে ভাবে, শিলিকে বউ না করতে পারলে, তেঁতুল গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে ও। শিলিকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না। ও যে কত ভালো, শিলিকে যে ও কত ভালোবাসে তা শিলিকে নিয়ে তার দোরবন্ধ ঘরের পালঙ্কে না শুতে পারলে, কী করে বোঝাবে শিলিকে?

গদাই-এর বুক ভেঙে এক মস্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে চৈত্র দুপুরের ঘুঘুর ঘু-ঘু-র-র-র-ঘু-ঘু-র-র-র, ঘুঘুর-র-র-র বিধুর স্বরের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়।

ঝিকা গাছের ডালে বসে বউ-কথা-কও ডাকে, বউ-কথা-কও—বউ-কথা-কও।

গদাই না বলে বলে, ও বউ কথা কও। কথা কও। কথা কও না ক্যান?

হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরতেই শিলির বাবা বলেন, চান কইরতে কতক্ষণ লাগেরে তর? তুই কি রাধা হইলি? কোন্ কৃষ্ণ বইস্যা থাকে তর চান-দ্যাখতে, কদমের ডালে?

ধক করে ওঠে শিলির বুক। থরথর করে ঝড়ের গাছের মতো বুক কাঁপে তার।

বাবা কি জেনে গেছে?

নরেশ বলেন, ক্ষুধায় প্যাট চুঁই চুঁই করে। পরেশ আইস্যা বইস্যা আছে। রাঁধন-বাড়নের কাম নাই।

শিলি নীচু গলায় বলে, সবই তো রাইন্ধ্যা থুইয়াই গেছি। খালি, গরম গরম ভাত লামাইয়া দিমুআনে পাঁচ মিনিটেই।

বলেই, রান্নাঘরে ঢোকে ও।

হাঁসের ঘর থেকে দুটো মুরগি কঁক-কঁক করে ওঠে। ওদিকে চোখ তুলে চায় শিলি অবাক হয়ে। মুরগি এল কোত্থেকে?

নরেশ বলেন, পরেশ আনছে তামাহাট থিক্যা। আজ হাট ছিল। রাতে মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধিসানে। ক্যাবলারে কইয়া বিকাল-বিকাল ওগুলানরে কাটাইয়া থুস্।

শিলি ভাবে, খাওয়া ছাড়া বাবার আর কোনো চিন্তা নেই। শুধু খাওয়া আর খাওয়া। ম্যালেরীর জ্বর ছাইড়া যাওনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধা আরও জোর হয় য্যান।

এবার ভাত চড়িয়ে দেয় শিলি রান্নাঘরে গিয়ে। চাল ধুয়েই রেখে গেছিল। ঘি-এর ভাণ্ডটা কাত করে দেখে, কতখানি ঘি আছে। তেলের শিশিটা, রান্নাঘরের বাঁশের ছ্যাঁচা-বেড়ার দেওয়ালে গোঁজা ছিল। সেটাতেও একবার চোখ বোলায়। গরম গরম ভাত। মুসুরির ডাল। কড়কড়ে করে আলু আর বেসন-দেওয়া কুমড়োশাক ভাজা। আর সঙ্গে কাঁটালের বিচি ভাজা। এই আজকের রান্না।

রান্নাঘর থেকেই, উনুনের সামনে আম-কাঠের ছোট চৌকিতে বসে বলে, কাকায় গেল কই? ভাত নামাইলে তো ঠান্ডা হইয়া যাইবানে।

আইতাছে আইতাছে। নদীতে গেছে চান কইরার লইগ্যা।

নদীতে?

বুকটা ধক্ করে ওঠে শিলির।

বলে, আমি তো আইতাছি নদী থিক্যাই। তারে দেখি নাই তো!

কোন নদীতে আর কোন পথে গেছিলি তুই, তা তুইই জানস্।

শ্লেষের সঙ্গে বলেন নরেশ।

শিলির শরীরের সব জলীয় ভাব, উরুসন্ধির জলজ স্নিগ্ধতা সব কাঠের উনুনের তাপে শুকিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। অনেকখানি ভয়েও।

হঠাৎই বাইরে উঠোনে, পরেশের গলা শুনতে পেল ও।

পরেশ বলল, কই গেলিরে শিলি? দ্যাখ, কারে লইয়া আইছি।

শিলি কোমরে আঁচল গুঁজে বাইরে এসেই দেখে, কাকার সঙ্গে গদাই।

ভয়ে আধমরাই হয়ে যায় ও। কিন্তু হেসে বলে, কী খবর? গদাইদা?

এইতো তোমাগো খবর লইতেই তো আইলাম!

বলেই, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গদাই, শিলির দিকে।

পরেশ বলে, আমাগো গদাই-এর মাথাখান্ একেবারে গ্যাছে গিয়া।

বড়ঘরের দাওয়ায় বসে নরেশ বলেন, ক্যান হইল কী?

ও নাকি আজ নদীর থিক্যা উইঠ্যা আসা পরীরে দ্যাখছে। কেবলই কয়, কী রূপ তার!

শিলি খিলখিল করে হেসে ওঠে। অভিনেত্রীর মতো।

বলে, বড়লোকের পোলাগো তো একমাত্র কাজই হপন দেখা। কী কও গদাইদা।

কমু কী আর। যা কই তা সত্যই।

তা তুমি কী কইরলা তারে দেইখ্যা? কথা কয় নাই কুনো? কোন ভাষায় কথা কয় পরীরা?

শিলি নিজের সপ্রতিভতায়, নিজেই ঝলমল করে উঠল।

রীতিমতো ভালো অভিনয় করছে ও। মেয়ে মাত্রই জন্ম-অভিনেত্রী।

ভাবল, শিলি।

কথা কী আর শোনবার অবস্থা ছিল আমার?

হে তো অজ্ঞান হইয়া পইড়্যা ছিল গাছতলায়। আমি কাছে গিয়া ডাক দিতেই, হায়! হায়! কী কান্না পোলার। যেন সাপে কাটছে তারে।

গদাই চুপ করে থাকল একটু।

তারপর বলল, বিশ্বাস করেন পরেশকাকা। সাপের কামড়ও ঢ্যার ঢ্যার ভালো আছিল। পাগল যে হইয়া যাই নাই, তাই যথেষ্ট। সে রূপ খালি-চোখে দেখনই যায় না। এত্ত তেজ।

শিলি বলল, তা ধুবড়ি থিক্যা বা তামাহাটে হাটের দিন যাইয়া একজোড়া গগলস কিন্যা আনো না ক্যান? আবারও যদি দর্শন পাও কুনোদিন। অমন ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুইখান যে যাইব গিয়া চিরদিনেরই লইগ্যা।

হ। ভাবতাছি। তাইই করুম। পরীর দেখা তো, সাপের লেখারই মতো। আবার কবে যে হঠাৎ কইর‍্যা ঘটব ব্যাপারখান, তাতো কওন যায় না। আজ থিক্যা যখনই নদীর পারে যামু তখনই সেই গগলসখান পইরাই যামুআনে।

তারপরই গদাই বলল, আমি যাই। বাবায় তা নাইলে চিন্তা করবোআনে। না-খাইয়া বইস্যা রইব।

শিলি বলল, দুগা গরিবের ঘরে খাইয়াই যাও না, যাইই রান্ধা হইছে। আইস্যাই যহন পড়ছ, খাওনের সময়ে। ভালো খাবার কিছু না, তবে ভালোবাসা তো আছে।

গদাই হেসে বলল, ভালোই কইছো তুমি। ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস? কপাল আমার!

বলেই, পা বাড়াল। বলল, আসুমানে অন্য একদিন। আগে আমারে নেমন্তন্ন পাঠাইও, তবে না আমু।

পরেশ বলল, মাসিমার কাছে সকালে শুইন্যা আইলাম পুতন নাকি আইতাছে ম্যানেজারের কে এক ছোকরা আত্মীয়রে লইয়া। সামনের শনিবারে। তা ওদের তো একদিন খাওয়াইতেই অইব। সেইদিন তোমারেও কইয়া দিম্যু। আইস্যো য্যান।

উত্তর না দিয়ে গদাই বলল, কে? কে আইতাছে?

গদাই-এর মুখের সব হাসি মিলিয়ে গেল। কালো হয়ে গেল অমন সুন্দর মুখটা।

পরেশ বলল, পুতন।

পুতন? আইতাছে নাকি?

গদাই ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল।

হ। তাইই তো কইলো মাসিমায়।

দেখুমানে।

বলেই, চলে গেল গদাই।

শিলির বুক নেচে উঠল আনন্দে। রাগও হল একটু। আসছেনই যদি এতদিন পর, তাও আবার সঙ্গে অন্য একজনকে নিয়ে কেন? একা আসতে যেন অসুবিধা ছিল! ভারী খারাপ!

নরেশ, চলে-যাওয়া গদাই-এর দিকে চেয়ে পরেশকে বললেন, গদাইটারে ভাবতাম বোকা-সোকা। কিন্তু কথা তো বেশ চোখা-চোখাই কয় দেহি।

পরেশ অন্যমনস্ক গলায় বলল, কোন কথা?

ওই যে, কইলো না? ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস?

পরেশ হেসে ফেলল, দাদার কথা শুনে।

বলল, যা কইছো। দারুণই কইছে সেন্টেলখান। এক্কেরে যাত্রার ডায়ালগ এরই মতো।

মাদারীহাট হয়ে, কুচবিহার হয়ে পুতনরা এসে পৌঁছেছিল, রবিবার সন্ধের বাসে, ধুবড়ি থেকে। ঠিক কখন আসবে তা জানত না। তবে জানত শিলি যে, বিকেলের দিকেই আসবে।

প্রথম-বিকেলে একবার কিরণশশীর কাছে গিয়ে কালো পাথরের বাটিতে একবাটি পায়েস দিয়ে এসেছিল।

পুতন যদি একাই আসত তাহলে থাকত ওখানে, যতক্ষণ না আসে। তবে, সঙ্গে অচেনা মানুষ নিয়ে আসছে। কেমন লোক তা কে জানে? তাই শিলি যায়নি ইচ্ছে করেই। পুতনের দরকার থাকলে সে নিজেই আসবে।

শিলি সামান্য দুশ্চিন্তাতেও আছে। নরেশবাবুর আর্থিক অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছে যে, তা বলার নয়। কাকারও কোনো স্থায়ী রোজগার নেই। শিকার করেই যা হয়। আজকাল বনবিভাগও কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে। ছাত্তারকাকাকে তো একবার অ্যারেস্টও করেছিল। ছাত্তারকাকু নাকি সংকোশের পারে হাতি মেরে তার দাঁত বিক্রি করে দিয়েছিল। পারমিট টারমিট নিয়ে তো শিকার কোনোদিনও করে না। তাই কাকার উপরে ভরসা বিশেষ নেই। কবে যে শ্রীঘরে যেতে হয়।

শিলির বাবাও ক্রমাগতই চাপ দিচ্ছেন গদাইকে বিয়ে করার জন্যে। গদাই-এর বাবার সঙ্গে বোধহয় কোনো অলিখিত চুক্তিও হয়েছে। শিলিকে গদাই-এর সঙ্গে বিয়ে দিলে ওঁকে বোধহয় একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেবেন গদাই-এর বাবা। শিলির মনে হয়। তাতে বাবা-কাকার খাওয়া-দাওয়া, ক্যাবলারও, ক্যাবলার মাইনে, বাবার সিগারেটের খরচ ইত্যাদি দিব্যি চলে যাবে। সেটা অবশ্য গদাই-এর বাবার কাছে কিছুই নয়। অত সম্পত্তি যাঁর। তার উপর কুঁজোর জল তো গড়িয়ে খান না এখনও। সঞ্চয় যা আছে তো আছেই, তার উপরেও সমানে রোজগার করে যাচ্ছেন। আর বংশের বাতি বলতে তো ওই গদাইই একা।

তবু শিলিকে এইভাবে বিক্রি করে দিয়ে তার বাবা নিজের আখের গুছোচ্ছেন এই কথাটা ভাবলেই বড় ঘেন্না হয় ওর। বাবার উপরে তো হয়ই, তার নিজের উপরেও হয়। তাছাড়া গদাইদাটা যদি লেখাপড়াও করত একটু আধটু। এদিকে চালাক-চতুর আছে। সেদিন যা খেলাটা দেখাল। বলে কিনা, ভালোবাসা কি চিবানোর জিনিস?

নরেশবাবু বলেন, কলেজে পড়লেই কেউ অমনিতেই বিদ্বান হয়ে ওঠে না। যে ছেলে ব্যাবসা করতে পারে, সে কি বুদ্ধি ছাড়াই পারে? বুদ্ধি না থাকলে তো গদাই বাবার অতবড় ব্যবসায় সাহায্য করতে পারত না! তাছাড়া সাধারণত ব্যাবসাদারের ছেলেদের বুদ্ধিটা দুর্বুদ্ধিই হয়। বিশেষ করে আজকাল। কী করে লোক ঠকানো যায়, কী করে পয়সা আরও বেশি রোজগার করা যায়, এই ধান্দাতে থাকতে থাকতে তাদের সুবুদ্ধি বলতে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। পুরো নজরটাই বেঁকে যায় ওদের। কিন্তু গদাই ওরকম নয়। সুবুদ্ধি নিয়েই ব্যাবসা করে ও। প্রাণে মায়া দয়া আছে। এমনকী, এও শুনতে পান নরেশবাবু লোকমুখে যে, বাবাকে না জানিয়েই ও কর্মচারীদের নানাভাবে সাহায্য করে। বাবা নিজে যা করতেন না, বা জানলে করতে দিতেন না।

গোপেন সুকুলকে বাড়ি করার জন্যে টাকা দিয়েছে গদাই, রহমতুল্লার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, সব খরচ দিয়ে। সুভাষের ছেলেটাকে ধুবড়ির কলেজের হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে। নিজে পড়াশোনা না করলেও পড়াশোনার প্রতি যে ওর শ্রদ্ধা আছে, এসবেই তা বোঝা যায়।

ছাইন্যার দাদাটার পা কেটে গেছিল কোকরাঝাড় স্টেশনে রেলের ইঞ্জিনিয়ারের ট্রলির নীচে পড়ে, তাকে ধুবড়ি ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে চাকরিও করে দিয়েছে এই গদাইই। ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে শলাই কাঠের

সাপ্লাই বিজনেসটাও গদাই একাই সামলায়। সাহেবরা তো এখনও আছে দু একজন। তাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা টথাও তো চালাতে হয়। স্কুল-কলেজে দু পাতা পড়ে কি লেজ গজায়? রবি ঠাকুর বা জি.ডি. বিড়লারা কি কলেজে পড়েছিলেন।

এসব নানা কথা বলে শিলিকে বোঝাতে চান তিনি। বলেন, যারা বেশি পড়ে, পড়াশুনায় ভালো হয়, তারা তো ওই ফার্স্টক্লাস পাওয়া পুতনের মতো ব্যাবসাদারদেরই চাকর হয়। যারা জানে, তারাই জানে যে, চাকরদের মধ্যে যতখানি নোংরামো, যতখানি নীচতা, খেয়োখেয়ি, ততখানি মালিকদের মধ্যে নেই। প্রমোশনের জন্যে পা-চাটে তারা, মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেয়, বউ বা বোনকে পাঠিয়ে দেয় উপরওয়ালা বা মালিকের খাটে। অনেক বড় বড় চাকর দেখেছেন নরেশবাবু। চাকরেরা সব চাকরই। আর এই বাঙালি জাতটা চাকরের বংশধর, চাকর হবার প্রত্যাশা নিয়েই ওদের জীবনের যা কিছু বিদ্যা-শিক্ষা, আর তাদের ছেলেদেরও বংশপরম্পরায় তারা চাকরই বানায়।

গদাই কলেজে পড়েনি, স্বাধীন ব্যাবসা করে বলেই যে খারাপ ছেলে, তা নয়। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই বড়লোকির মধ্যে যারা মানুষ হয়, তাদের মনে অনেকরকম ক্ষুদ্রতা, ইতরামি, ছিঁচকেমিই থাকে না। হা-ভাতে ঘর থেকে এসে যেগুলো বড়লোক হয়, তাদের বেশিরভাগেরই বড়লোক হওয়ার প্রক্রিয়ার রকমটা নরেশবাবু ভালোই জানেন। এক জীবনে তো আর কম দেখলেন না। তাই অনেক ভেবেচিন্তেই নরেশবাবু শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়ে দিতে চান।

তাছাড়া, পুতন ছিল ভালো। ওই কলকাতায় গিয়ে চা-বাগানে চাকরি নিয়ে, ডুয়ার্সে যাবার পর থেকেই, ওর চোখে মুখে লোভ চকচক করে। নরেশবাবুর মনে হয় যে, পার্থিব সুখের জন্যে ও করতে পারে না, এমন কিছুই নেই। ভালো-থাকা ভালো-খাওয়ার জন্যে, একটি স্কুটার বা টি.ভি কেনার জন্যে পুতন এখন মানুষও খুন করতে পারে।

গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে গ্রামেই এসে বাসা বেঁধেছেন নরেশবাবু, ইচ্ছে করেই। শান্তি যতটুকু থাকার, তা এখনও গ্রামেই আছে, এই গরিবির মধ্যেই, যেন-তেন-প্রকারেণ বড়লোকির মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, সম্মান নেই। সুখ তো নেইই। মেয়ের ভালো চান বলেই গদাই-এর কথা ভাবেন। তিনি নিজে আর কতদিন! শিলির মায়েরও তাই কথা ছিল। দারিদ্র্য যদি মোটামুটি রকমের হয়, মধ্যবিত্তর জীবন হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর, সুখের, নিরুদ্‌বেগের জীবন। জীবনের মানে শুধুমাত্র ভালো-খাওয়া, ভালো-থাকা নয়, তার চেয়েও বড় কিছু। মূল্যবোধের উপর যে জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, তার ভিত, বুনিয়াদ অনেকই বেশি শক্ত হয়, মূল্যহীন সমাজ বা সংসারের স্বাচ্ছল্যের চেয়ে।

কিন্তু নরেশবাবু এও দেখেছেন যে, দারিদ্র্য অসহনীয় হলে তা থেকে যেসব খারাপ জিনিস জন্মায়, তা বড়লোকির খারপত্বর চেয়েও অনেকই বেশি। মানুষের তখন অমানুষ হয়ে যাবার প্রবণতা জন্মায়। তিনি নিজের জীবন দিয়েই এটা উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানের অপরিসীম দারিদ্র্য যেন তাঁর অমন রূপগুণের একমাত্র মেয়েটার জীবনেও না বর্তায়, তাইই দেখে যেতে চান উনি।

বড়লোকি যেমন ভালো নয়, মোটামুটি খেতে-পরতে না পেলে মানুষের মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রাখাও যে দায় হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝেই তিনি নিজেও যে অমানুষ হয়ে উঠছেন, তাও বুঝতে পারেন। খিদের মতো খারাপ রোগ আর কিছুই নেই। মানুষের শরীর, মানুষের মন, সবকিছুই ছুঁচোর মতো কুরে কুরে খেয়ে যায় এই খিদে। শিলিটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যে করেন, সেটা এই দারিদ্র্যরই জন্যে। নিজের অপারগতারই জন্যে। অপারগতা অসীম হলে, তখন অপারগ, অসভ্য, অবুঝ, অভব্য হয়ে ওঠে। এই দারিদ্র্যর কামড় যে না খেয়েছে, সে কখনোই জানবে না ওঁর জ্বালা।

নরেশবাবুর, গদাই বা তার বাবার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও প্রত্যাশা নেই। উনি জানেন না, শিলি

কী ভাবে তাঁর সম্বন্ধে। শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি কুমারগঞ্জ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, এই ভিটে পরেশকে লিখে দিয়ে। কারণ, চোখের সামনে থাকলেই জামাই তাঁর জন্যে কিছু করবেই। মেয়েরও কষ্ট হবে বাবার জন্যে। মেয়ের বিয়ের পরে উনি পথে পড়ে মরলেও কোনো দুঃখ নেই ওঁর। এই জীবন, যে-জীবনে কাউকেই কিছুমাত্র দেবার ক্ষমতা নেই, কাউকেই সুখী করার ক্ষমতা নেই কোনোভাবেই; সে জীবন থাকা না-থাকা সমান।

আত্মহত্যা করে মরে যাবেন বলেও ভাবেন, কখনো কখনো। জীবন মানে তো শুধু নিশ্বাস ফেলা বা প্রশ্বাস নেওয়া নয়। জীবন যদি জীবন্ত না হয়, তবে তা নিজে হাতে নিভিয়ে দেওয়াই ভালো। জীবন যদি ঈশ্বরের দান হয়, তবে সে জীবন নিভিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতাও ঈশ্বরেরই দান। সব জীবেরই মতন, মনুষ্যেতর জীবের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে, মরে যাওয়া অনেকই বেশি সম্মানের।

গা-টা ধুয়ে শিলি একটি পরিষ্কার করে ধোওয়া কালো-সবুজ ডুরে শাড়ি পরেছিল। চোখে, কাজল দিয়েছিল। গলায় কুঁচফলের লাল-কালো মালা পরেছিল। উঠোনের কোণ থেকে তুলে গন্ধরাজ ফুল গুঁজেছিল খোঁপায়। লাল-কালো অথবা লাল কিংবা কালো কোনো ফুলই হাতের কাছে পায়নি যে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে খোঁপায় দেয়। কালো ব্লাউজ পরেছে একটি। সবচেয়ে ভালো "ব্রা"টি বের করে পরেছে আজ। তিনটি ব্রা আছে ওর সবসুদ্ধু। তার মধ্যে একটিই আস্ত। ওর চলে-যাওয়া মায়ের ব্রা আছে আলমারিতে, গোটা পাঁচেক। কিন্তু তার কুমারী বুকে তা ঢলঢল করে। ওর বুক যতদিনে মায়ের ব্রা-এর যোগ্য হয়ে উঠবে ততদিনে ব্রাগুলো ছিঁড়েই যাবে, নয়তো ইঁদুরে কেটে দেবে। ব্রা কাটলে কাটুক! ইঁদুরে-বাদুড়ে বুক না কাটলেই হল।

কোনো মেয়েই চায় না যে, তার সৌন্দর্যের মধ্যে সবচেয়ে যা সুন্দর, সেই বুক তাড়াতাড়ি মায়েদের মতো বড় হয়ে যাক।

বারান্দার দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল শিলি। বাবা, নগেন জ্যাঠাদের বাড়ি গেছেন। কাকা বাসস্ট্যান্ডে যায় এই সময়ে। রোজই। পান খায়, গল্পটল্প করে। দু-দিকের বাস ক্রশিং করে। নানা খবরাখবর চালাচালি হয়। ড্রাইভারদের দিয়ে কখনো-সখনো মুরগিটা, পাউরুটিটা আনিয়েও নেয়, আপ বা ডাউনের কোনো জায়গা থেকে।

চাঁদ উঠেছে এখন বাঁশঝাড়ের পেছনে। সন্ধের আগে একঝাঁক চাতক পাখি চমকে চমকে বেড়াচ্ছিল, ফটিক-জল, ফটিক-জল বলে। বছরের এই সময়টাতেই পাখিগুলোকে দেখা যায়। অন্য সময়ে কোথায় যে যায়, কী যে করে ওরা, তা কে জানে!

একটা লক্ষ্মী পেঁচা উড়ে এসে বসল, সিঁদুরে আমগাছটার ডালে।

চাঁদের আলোয় একটুক্ষণ বসে থেকেই উড়ে গেল।

লক্ষ্মী পেঁচা, লক্ষ্মীকে আনে ঘরে। এলে, ভালো হয় খুব।

একটা গান গাইতেন মা, লক্ষ্মী বন্দনার। মনে পড়ে শিলির। ভারী সুন্দর গানটি;

"এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খ কমল করে
এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে"

লক্ষ্মীকে ত ডাকে সকলেই, কিন্তু লক্ষ্মী কি সাড়া দেন সবার ডাকে?

শিলি লক্ষ্মীকে অবশ্যই চায়, কিন্তু এই দারিদ্র্যর জন্যেও তার এক বিশেষ অহংকার আছে। দারিদ্র্যমাত্রই প্রত্যাশায় ভরা, ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা। তার গর্ভে যে কী ঢেকে রাখে, তা শুধু দারিদ্র্যই জানে। দারিদ্র্যর মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। শিলি অন্তত করে না লজ্জাবোধ। লজ্জা, দারিদ্র্য লুকোনোর চেষ্টার মধ্যেই।

চারপাশ থেকে চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ উঠছে। পাঁচমিশেলি গন্ধ। তার সঙ্গে সাবান দিয়ে ভালো করে চান-করে ওঠা শিলির গায়ের সুগন্ধও মিশে গেছে। চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ শুধু ওঠে না, উঠেই পাগলামিভরা চৈতি হাওয়াতে ইতস্তত ছড়িয়ে যায়। ফতিমা দিদির বুকের ভাঁজের আতরের গন্ধর মতন তা ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে, সমানভাবে। মনটা পাগল-পাগল করে। শুধু মনটাই করে না শরীরটাও, কে জানে! কোনটা শরীরের পাগলামি আর কোনটা মনের, জানে না ও।

আতরের গন্ধে নিজেকে কখনো কখনো খুউব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ওর।

আজ চান করে ওঠার পর যখন জামা কাপড় পরে কাজল আঁকছিল চোখে, দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন লণ্ঠনের আলোতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল শিলিকে। নিজেরই চোখে। বেশ, বউ বউ। যেদিন ও বউ হবে সস্তার বেনারসী পরে, সোনালি রুপোলি রিবন দিয়ে খোঁপা বাঁধবে, পায়ে আলতা পরবে, গায়ে-হলুদের হলুদ হলুদ ছোপ লেগে থাকবে বুকের ভাঁজে, দুই কুঁচকির পাশে, নাভিতে, ক্যালকাটা কেমিকেলের কান্তা সেন্টের গন্ধে ভুরভুর করবে যেদিন তার গা, নিজের গায়ের মিষ্টি গন্ধের চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে সেদিনকার সেই স্বপ্নের সুখেরই মতন সুন্দর এক ভাব ফুটেছিল তার আলোকিত মুখখানিতে।

আজকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। বাড়িতে কেউই নেই এখন। ক্যাবলাটাও ছুটি নিয়ে গেছে গৌরীপুরে। এই চাঁদের রাতে, একা-বাড়িতে পুতনদা যদি আসত, যদি দুহাতে তার এই মুখখানিকে আদরে ধরে তার ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু খেত, বেশ হত তাহলে।

ও খুব ন্যাকামি করত, ঢঙ করে বলত, করো কী? অসভ্য! ছাড়ো ছাড়ো! তোমার দাড়িতে লাগে। জ্বালা করে গাল। দাড়ি কামাও নাই ক্যান্? জংলি!

পুতন বলত, কামাইছিলাম তো। তবে সেই সাত সকালে। আমি কী আর জানতাম ছাই যে, তোমারে চুমু দিমু আজ? তাইলে তো বিকালে আরও একবার কামাইয়াই আইতাম।

পুতনদা তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরও অনেকক্ষণ তার ঠোঁট দুটি জ্বলত। জ্বালাতেও কত্ত ভালোলাগা। কত রকমের জ্বালাই না থাকে। সত্যি।

দেখতে দেখতে কখন যে চাঁদের আলোতে ভরে গেছে চারপাশ, নিঃশব্দে, খেয়ালই করেনি শিলি। হিজল গাছটার মাথার উপরে সন্ধ্যাতারাটা উঠে স্নিগ্ধ নীল দ্যুতিতে ফুটে রয়েছে, যেন কোনো নীলরঙা উজ্জ্বল ফুল।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। টর্চের আলো এসে পড়ল গেটের কাছে। চাঁদের আলোতে ফিকে দেখাল সে আলো। পুতনের গলার স্বর না? তাইই তো। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে।

শিলি! শিলি আছস্ নাকি? কাকাবাবু? পরেশকাকু?

আমি পুতন!

কে?

শিলি, জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল দাওয়ায় হেলান-দেওয়া অবস্থা থেকে।

মুখে বলল, ভিতরে আইতাছো না ক্যান? বাবায়-কাকায় কেউই বাড়িতে নাই। আমি একাই আছি।

পুতনের সঙ্গের মানুষটি বলল, ফার্স্ট ক্লাস। চাপা গলাতে।

শুনল, শিলি।

মানুষটার গলার স্বরটা ভালো লাগল না ওর। গলার স্বরেও মানুষের অনেকখানি বোঝা যায় লোকটা ভালো নয়। এই কি সেই?

শিলি বলল, মনে মনে।

পুতন লোকটিকে নিয়ে চ্যাগারের দরজা দিয়ে ঢুকে এল।

বলল, দ্যাখ শিলি, কাকে এনেছি।

পুতনদার মুখে এমন কোলকাতাইয়া ভাষা শুনে, ঘাবড়ে গেল শিলি।

পুতন আবারও বলল, অনেকক্ষণ আগেই আসতুম, কিন্তু আমার বন্ধু রাজেন, চান করতে, পাউডার মাখতে এতই সময় নিল যে কী বলব। কলকাতার মানুষ তো! বড়লোকের ছেলে।

শিলি, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে মাদুর এনে বিছিয়ে দিল, বড় ঘরের দাওয়াতে।

রাজেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আছে। গা থেকে সেন্টের মিষ্টি নয়, ভীষণ উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছে, ভুরভুর করে। গন্ধটাও ভালো নয়। সুগন্ধের মধ্যেও, কিছু সুগন্ধি কাছে টানে শিলিকে; আর কিছু সুগন্ধ দূরে সরায়। হয়তো সব মেয়েরই এমন হয়। হয়তো পুরুষেরও হয়, যারা সুগন্ধ ভালোবাসে। তাছাড়া, ওদের দুজনের মুখ থেকেই ভক্‌ভক্‌ করে কীরকম একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তাতে গা-গুলিয়ে উঠল শিলির। গন্ধটা কীসের তা বুঝল না, তবে অনুমান করতে পারল। পেরেই, পুতনদার কথা ভেবে, ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল। প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল বুকের মধ্যে।

পুতন বলল, ওকী? দূরে কেন? আরে কাছে এসে বসো। কলকাতা থেকে তোমার জন্যে নতুন বন্ধু আনলুম। কতা-বাতরা বলো।

পুতনের মুখে এই ভাষা শুনে শিলির ক্রমশই রাগ বাড়তে লাগল। বাকরোধ হয়ে গেল। সত্যিই। অনেকেই বদলে গেছে মানুষটা। যে-সব মানুষ নিজের ছেলেবেলা, নিজের মা-বাবা, নিজের পরিবেশ, অনুষঙ্গ, নিজের মুখের ভাষাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে, দুটো পয়সা বা দুটো বেশি পয়সা রোজগার করার জন্যে, সেই সব মানুষ কখনোই খাঁটি হয় না।

মেকি মানুষরাই এরকম করে। হীনমন্য মানুষেরা। অমন ভণ্ড মানুষদের চিরদিনই ঘেন্না করে এসেছে শিলি।

মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল শিলির।

এমন সময় পুতনদার সেই বন্ধু রাজেন যার নাম. পুতনদাই বলছিল, ফস করে হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চটি ফোকাস করল শিলির মুখে। হঠাৎই আলো পড়ায় দুটি চোখই বুজে গেল শিলির।

রাজেন নিজের মনে বলল, খাসা! ভিলেজ বিউটি!

পুতন চাপা ধমক দিল। আঃ! রাজেন!

হলটা কী? বিউটি দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট করব না?

পুতন সামলে নিয়ে বলল, বুজেচো শিলি, রাজেন কলকাতার খুব বড়বাড়ির ছেলে। ও হচচে আমাদের বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয়। কোনোদিন গ্রামই দেকেনি তো। তাই এয়েচে আমার সঙ্গে। গ্রামের মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর দারুণ ইন্টারেস্ট। তোমাকে দেখে তো প্রেমেই পড়ে গেচে। অবশ্য পড়েছিল আগেই। আমার মুখে তোমার গল্প শুনে শুনে।

শিলি পাথরের মূর্তির মতো বসেছিল।

লক্ষ্মী পেঁচাটা উড়ে গেছিল আমগাছ ছেড়ে, অনেকক্ষণ। শিলিকে ছেড়ে সব স্বপ্নও উড়ে গেছিল। অমন গন্ধভরা উদ্‌বেল চৈত্রর চাঁদের রাতে স্তব্ধ হয়ে এই নতুন পুতনের সামনে কাঠের পুতুলের মতন বসেছিল শিলি।

ভাবছিল, পুতন আসার স্বপ্নটা সত্যি না হলেই ভালো হত।

একটা গান শুনিয়ে দাও তো শিলি, আমার ফ্রেন্ডকে।

শিলি বিরক্ত গলায় বলল, যখন তখন গান আসে না আমার।

ককন আসে?

রাজেন ভকভক করে গন্ধ ছড়িয়ে বলল।

যখন আমার ইচ্ছে হয়।

শিলি বলল।

শক্ত করে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

এখন একটু শোনালে হত না। আজ কী সুন্দর রাত মাইরি। গান গাইবার মতো রাত। ইচ্চেকে কি হওয়ানো যায় না?

শিলি কিন্তু সত্যিই দারুণ গান গায়।

পুতন বলল, শিলিকে রাজি করাবার আশায়।

কী গান গায়?

কত গান। রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, শ্যামাসংগীত।

"তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ? যমুনায় জল আনতে, আনতে যাচ্চো, সঙ্গে নেইকো কেউ?" এই গানটা জানো নাকি গো?

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে বলল, রাজেন।

শিলি মাদুর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না। আমি জানি না। আর আমারে "তুমি" কইর‍্যা কইয়েন না আপনে। আপনে কইর‍্যাই কয়েন।

রাজেন হাসল, রসিকতা করে বলল, আচ্ছা! তাই কম্যু।

বলেই, বাঙাল ভাষাটা ঠিক বলতে পারল কী না তা জানবার জন্যে পুতনের দিকে চাইল।

পুতন বলল, সাতবোশেখির মেলা তো এসে গেল। সামনের রবিবার। আমার বন্ধুকে নে যাব দেখাতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? শিলি?

না।

না কেন? তোমার বড় গুমোর হইয়েচে দেকচি।

"গুমোর' কথাটা শোনেনি আগে শিলি। কেউই বলেনি তাকে।

বুঝল, কথাটার মানে দেমাক। পুতনের মুখে ওইরকম বিজাতীয় ভাষা শুনে ও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। বিড়ালে যেমন করে কবুতরের পালক ছিটিয়ে রক্তের ফিনকি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে খায় তেমন করেই শিলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল এই নতুন ক্যালকেশিয়ান কালচারের পুতন।

শিলি স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল, কত অল্পদিনে কত্ত বদলে যেতে পারে একজন মানুষ!

তারপর ভাবল, হয়তো মানুষই পারে। কুকুর-বেড়ালের পক্ষেও সম্ভব নয়।

পুতন বলল, শিলি, আমার মুখ চেয়ে 'না' করো না তুমি। আমি নরেশকাকাকে বলব। মাও তোমাকে বলবেন। মানে, আমার মা।

শিলি হঠাৎ বলল, না। আমি কোথাও যাম্যু না। আর তোমাগো ভালয় ভালয় কইতাছি, বাবা কাকা আসনের আগেই তোমরা চইল্যা যাও পুতনদা। তোমার তো অনেকই উন্নতি হইছে দেহি! মদও খাইতাছো আজকাল! কাকা আইয়া পড়লে বিপদ অইব কিন্তু। গুলি কইর‍্যা মাইরাও ফ্যালাইতে পারে তোমাগো। একা বাড়িতে আমি, আর তোমরা মদ খাইয়া আইছো আমার লগে দেখা করনের লগ্যে। তোমাগো সাহস তো কম না!

কইচে কি পুতন? ও পুতন? ময়না কইতিচে কী? আরে ভিলেজ-বিউটি, মদ খেয়েই তো মানুষে মেয়েমানুষের কাচে আসে! তুমি তো অবাক করলে মাইরি। আমিই কি তোমার পত্তম নাগর? অ্যাঁ।

এমন সময় দূরে সাইকেলের ঘন্টি বাজল।

টর্চের আলোর ঝলকও দেখা গেল।

আতঙ্কিত শিলি বলল, ওই কাকায় আইতাছে। তোমরা পিছনের দরজা দিয়া পালাও। কাকার সামনে মদ খাইয়া যদি যাও, তো বিপদ হইবনে।

পুতন বলল, ন্যাক্কামি কোরো না। তোমার কাকা যেন মাল খায় না।

পুতনের মুখে এমন ভাষা এবং সে ভাষা উচ্চারণ করার ভঙ্গি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল শিলি।

এমন সময় কাকা এসে ঢুকলেন, সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে।

এই যে! পরেশকাকু! আমি এসেছি। সঙ্গে আমার বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয় রাজেন চাটুজ্যে।

পরেশ কাছে এসে, শেয়ালের মতো নাক তুলে বাতাস শুঁকে বলল, বাবাঃ পুতন দেখি লায়েক হইছো।

পুতনের ভাষার-নতুনত্বের ঘোর তখনও কাটেনি পরেশের।

সেই ঘোরের মধ্যেই বলল।

রাজেন বলল, পরেশকাকা, ওর দোষ নেই। আমিই খাইয়ে দিয়েচি ওকে। আপনি খাবেন?

কী?

চমকিত পরেশ বলল।

হুইস্কি। একটা আস্ত পাঁইট পকেটেই আছে। ব্ল্যাক-নাইট। বিলিতি মাল।

মদ আমি খাই পুতন। কিন্তু বাড়িতে খাই না। সকলের সঙ্গেও নয়।

এটা কি ভণ্ডামি নয় পরেশকাকা?

রাজেন বলল।

সেটা আমি বুঝব।

তারপর পুতনের দিকে ফিরে বলল, মদ খাইয়া বাড়িতে আইস্যা শিলির লগ্যে কী গল্প করতাছিলি তুই?

পুতন একটু ঘাবড়ে গেল।

বলল, এই রাজেনকে নিয়ে সাতবোশেখির মেলায় যাব। তাই শিলিকে বলতে এসেছিলাম। ও যদি যেত, তবে আমার কলকাতার ফ্রেন্ড খুশি হত।

পুতন বলল।

পরেশ বলল, এখনও দেরি আছে সাতবোশেখির মেলার। তা শিলি কী কয়?

ও তো বলল, যাবে না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না পরেশকাকা। ও গেলে রাজেনের ভালো লাগত। আমাদের এই গ্রামে তো বায়োস্কোপ-থিয়েটার কিছুই নেই। বেচারার সময়ই কাটছে না। শিলি গেলে বেশ এনজয় করত ও।

পরেশ বলল, শিলি তো আর খুকি নয়। মেলাতে তো ও যাইব নিশ্চয়ই। তবে তোমাগো লগ্যে যাইব কী যাইব না, তা সম্পূর্ণ ওরই ইচ্ছা। ভাইবা দ্যাখনের সময় তো যথেষ্টই আছে। না, কি কও পুতন?

হ্যাঁ, তাত আচেই।

পুতনের চেহারা, চাল-চলন, মুখের ভাষা সবই আমূল বদলে গেছে। পড়াশুনো করে, বড় পরীক্ষা পাশ করে, বড় মানুষ হতে গেলে যে নিজেকে বদলাতে হয় তা জানত পরেশ এবং সেই জন্যে হয়তো, সবাইই যাকে "বড় হওয়া" বলে তা ও কোনোদিনই হতে চায়নি। সকলের মতো ও যে হয়নি, তা জেনে নতুন করে আশ্বস্ত হল পরেশ। পুতনটার জন্যে দুঃখ হল। ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছে, শহরের চোর-জোচ্চোরদের মতো হয়ে গেছে স্বভাব। কিরণমাসির একমাত্র বেঁচে-থাকা

ছেলেটা পুরোপুরি বুঝি অমানুষই হয়ে গেল! এর চেয়ে কিরণমাসির অন্য ছেলেগুলোর মতন ও-ও মরে গেলেই ভালো হত।

কী ভাবছেন পরেশকাকা?

ভাবতাছি। তা, ভাবনা তো আর দেখান যায় না। আইজ তোমরা ওঠো। আমি না হয় মদটদ খাই। কিন্তু দাদাতো এসব একেবারেই পছন্দ করে না। জানোই তো তুমি। পথে দাদা আসতাছে দেইখ্যা আইলাম। তারিণীদার বাড়ি থিক্যা বাইরাতে দেখলাম। আইয়া পইড়লো বইল্যা। দাদার আসনের আগেই তোমরা ওই পশ্চাতের চ্যাগারের দরজা দিয়া পলাও। নইলে, কীসে কী হয়, তা কহন যায় না। দাদায় তো লো-প্রেসারের রোগী। হঠাৎ হঠাৎ রাইগ্যা যায়। জানোই তো। কী পুতন? জানো, না কি?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। জানব না। নরেশকাকার মেজাজ তো নোটোরিয়াস। আমাকে দু-ঘা বসিয়ে দিলেই বা কী? কিন্তু আমার ফ্রেন্ডের তো ইজ্জৎ বলে একটা ব্যাপার আছে।

বাঃ। শুইন্যা বড় আনন্দ পাইলাম। ইজ্জৎ জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ দ্যাশে পেরায় গণ্ডারের মতোই দুইষ্পাপ্য হইয়া উঠছে। হত্যাই আনন্দ পাইলাম।

এবার বাইরে নরেশবাবুর কাশির শব্দ আর টর্চের আলো শোনা এবং দেখা গেল।

পরেশ বলল, ওই যে আইতাছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুতন রাজেনকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বাঁশবনের নীচের পথে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়েই, কথা বলতে যাচ্ছিল রাজেন। পুতন মুখ চেপে ধরল। কিছুদূর ওকে মুখ-চেপে নিয়ে গিয়ে, মুখ-থেকে হাত সরিয়ে নিল।

রাজেন বলল, তুমি কী মাইরি গুরু! শালা! গা গরম করতে করতেই বিবি পালাল। তোমাকে তো বলেইচি গুরু, পেটে আমার মাল পড়লে মাগি আমার চাইই। তোমাদের গ্রামে খারাপ পাড়া-ফারা নেই কি? রেডলাইট এরিয়া। যেখানে শান্তির সঙ্গে ট্যাকের কড়ি গুনে দিয়ে মাগিদের খোমা দেখা যায়। নিজের খুপরিতে, নিজে সম্রাট হয়ে, নিজস্ব সুন্দরীকে নিয়ে যা খুশি করা যায়?

পুতন বলল, না। এই গ্রাম ভদ্রলোকদের গ্রাম।

মরে যাই! মরে যাই! কী কতাই শোনালে মাইরি। ওসব আমার জানা আছে। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচে না এমন মেয়েছেলে নেই কোনো ভদ্রলোকের গেরামে, এমন কথা আর যে মক্কেলেই বিশ্বাস করুক, এই মক্কেল করবে না। আসলে বলো যে, তুমি ঝেড়ে কাশছ না।

পুতন একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, সত্যিই বলছি থাকলেও আমি জানিনা।

যাঃ শালা! এখন কী করি? গা গরম হয়ে গেছে যে! এখন ঠান্ডা হই কী করে?

একটু এগিয়েই, ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল ওরা। সামনে হরিসভার বাঁধানো চাতাল। পাশে পুকুর। হরিসভার চারপাশে হাসনুহানার ঝাড়। মিষ্টি গন্ধ ভাসছে চাঁদ মাখা আকাশে।

রাজেন হরিসভার চওড়া, সিমেন্ট-বাঁধানো, চাঁদের-আলোতে চকচক-করা চাতাল দেখে বলল, বাঃ। ওই তো মাল খাওয়ার জায়গা। তা গুরু, প্রথমেই এইকানে নিয়ে এলে না কেন? এসো, এই চাতালে বসে নতুন পাইটটাকে শেষ করি।

পুতন বলল, ছিঃ। এখানে অষ্টপ্রহর কেত্তন হয়। হরিনাম হয়। পালাগান সব। কখনো চব্বিশ প্রহরও হয়। হরিসভার চাতালে বসে মদ খাবে কী?

যাঃ শালা। এ ক্যালানে বলে কি মাইরি! সেই শায়েরি জানো না? এক মাতাল মসজিদে বসে

মাল খাচ্ছিল। তো মৌলবি এসে বলল, এখানে বসে টানচো তুমি? কেমন বে-আক্কেলে লোক হে? জানো না, এখানে খুদাহ্ থাকেন?

বলেই রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে ভালো করে জোড়াসনে বসে পকেট থেকে পাইটটা বের করল।

তারপর কী হল, শোনো। নিজেই বলল, আবার।

কী হল? বিরক্তির গলায় শুধোল পুতন।

সে শালা মাতাল, মৌলবির দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলল,

"পীনে দে মুঝে
মদজিদমে বৈঠকর।
ইয়ে উ জাগে বাতাঁদে যাহাঁ খুদাহ্ ন হো।"

মানে?

পুতন শুধোল। তখন বিরক্ত গলায়।

রাজেনকে এখানে এনে যে ও ভুল করেছে, তার নিজের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি করেছে, তা ক্রমশই ও বুঝতে পারছে।

আবারও বলল পুতন, মানে কী হল তোমার ওই শায়রির?

শোনো গুরু, মানেটা হল, খুদাহ যদি একমাত্র মসজিদেই থাকেন তো ভালো কতা। আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে এমন জায়গা দেখিয়ে দাও তো বাওয়া, যেখানে খুদাহ নেই। একটা জায়গা দেকাও। তাকেই বলল। সারা পৃথিবীটাই ত ঈদগাহ্। তোমার হরিসভা তো মসজিদেরই মতো ধম্মোস্থান? নয় কি? আরে!

কী হল? ঢালো মুখে এট্টু। মেজাজ বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে গুরুর।

নাঃ। ওমনি।

নাও, ঢালো।

না, না। আমি আর খাব না।

সে কি? কী হল?

নাঃ।

পুতন ভাবছিল, নিজের জায়গায় খারাপ হতে লজ্জা করে। সকলেরই তো পরেশকাকার মতো বুকের পাটা নেই যে, যাইই করে তা বুক ফুলিয়ে করে। বাবা যখন বেঁচেছিলেন, বাবার মুখে শুনেছিল যে, অ্যামেরিকান আর টমী সৈন্যরা অথবা চা বাগানের ম্যানেজারেরা যে বেলেল্লাপনা এদেশে এসে করেছে, তা নিজেদের দেশে করার কথা তারা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। পুতনও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে, নিজের শিকড়ের কাছাকাছি থেকে, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-পরিচিত, নিজের আজন্ম পরিবেশের মধ্যে থেকে, একজন মানুষের খারাপ হয়ে যেতে অনেক বেশি খারাপত্ব লাগে। ভালো হতে যে জোর লাগে, খারাপ হতেও তেমনই জোর লাগে। স্রোতের শ্যাওলা যারা, তাদের কথা অন্য। পুতন নিজের কাজের জায়গায়, চা-বাগানে কুলি বস্তীতে বা ওর নির্জন কোয়ার্টারে যা কিছুই করতে পারে রাজেনের সঙ্গে, তা ও নিজের গ্রামে এসে করার কথা ভাবতেও পারে না। মনে হয়, ভাবলেও অপরাধবোধ জাগে এক ধরনের। এই বোধটা এখানে আসার আগে ওর ছিল না। এখানে এসে বুঝছে।

কী হল গুরু? খাও এক চুমুক।

বলেই, জোর করেই পাইটের বোতলটা এবারে মুখে ধরে দিল পুতনের।

পুতন, আপত্তি সত্ত্বেও বড় চুমুক লাগাল একটা।

মদের এই দোষ। অথবা গুণ! বিবেক যখন চুলকোয়, মন বলে কাজটা ভালো হচ্ছে না, অন্যায় করছ খুব; তখন জোর করে মদ খেয়ে নিলে বিবেকের চুলকুনি কমে আসে। মন বলে, ঠিক আছে। ঠিক কচ্চো বাওয়া।

ভালো উকিলেরই মতো, মনও গেলাসের জলের দিকে যেন তাকিয়ে প্রয়োজনানুসারে প্রমাণ করতে বসে যায় যে; গেলাসটা 'আধভর্তি'? না "আধ খালি"?

পেটের মধ্যে গিয়ে মস্তিষ্কে ক্রিয়া শুরু করল মদ। ধীরে ধীরে পুতনের জেগে ওঠা বিবেক, তার আশৈশব অনুষঙ্গর শালীনতা, তার মূল্যবোধ; গলে যেতে লাগল অ্যালকোহলের নিঃশব্দ, প্রলয়ংকরী প্রক্রিয়াতে। ধীরে ধীরে।

পুতন একটি হেঁচকি তুলে বলল, কেমন দেখলে ভাই?

কী?

একটু যেন অন্যমনস্ক, রাজেন বলল।

শিলিকে?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, ওঃ। খাসা মাল। সুইট নাইনটিন ইয়েট আনকিসড।

একটু চুপ করে থেকে, রাজেন বলল, তবে কী জান? আসল ব্যাপারের সময় এই সব আনটাচড জিনিস বড্ডই ন্যাকামি করে। অবশ্য পুরো মজাটাই আবার সেখানেই। রেজিস্টেন্স না থাকলে কোনো ভূখণ্ডই জয় করে মজা নেই। কতাটা বলত, আমাদের নাদুদা। আমার গুরু।

বলেই, রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে দাঁড়াল। তারপর চাঁদের আলোয় সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করতে করতে, না, যেন চাঁদের আলোতে ভাসতে ভাসতে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল পুতনের সঙ্গে।

পুতনের ভয় করতে লাগল। গ্রাম্য জায়গা। তার ওপরে কাছেই ঘোষেদের বাড়ি। সে বাড়ির ছোটকর্তার কানে যদি এই কথোপকথন যায়, তবে এক্ষুনি ওদের দু'জনকে মেরে পুকুরে লাশ ফেলে দেবে। এ তো কলকাতা নয়। এখানে তো চেঁচিয়ে-বলা-কথাকেও ঘরে ঘরে পাখা, আর রেডিয়ো-টিভি, ট্রাম আর বাস আর গাড়ির আওয়াজ ডুবিয়ে দেয় না, উড়িয়ে দেয় না। তা ত রাজেন জানে না! এখানে ফুলশয্যার রাতের স্বামী-স্ত্রীর ফিসফিসে কথাও পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়। নাঃ। রাজেনকে নিয়ে এসে কাজটা ও ভালো করেনি আদৌ। এবারে সে নির্ঘাতই বিপদে পড়বে। বুঝতে পারছিল পুতন।

পুতন ভাবছিল, যে, মা কিরণশশী জেগে বসে আছেন ওদের খাবার নিয়ে। হোন্দলের মা কি আর এতক্ষণ আছে? বেলাবেলিই তো চলে যায়। মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মায়ের সামনে বসে খেতে হবে বলে বিবেক, রাজেনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'খচ্‌খচ্‌' করছে একটু।

কিন্তু হলে কী হয়। শুধুমাত্র জন্মদাত্রীর অধিকার ছাড়া, অন্য কোনো অধিকার তো নেই মায়ের। এই বাড়িটাও বাবা তাকেই উইল করে দিয়ে গেছেন। কিরণশশীর তো কোনোই জোর নেই। পুতন যা বলবে, যা করবে; তাইই এখন নিয়ম। অশক্ত, বৃদ্ধা, পরনির্ভর কিরণশশীর সাধ্য কী পুতনের মুখের উপর কথা বলেন কোনো! শহরে কিছুদিন থেকে, বাগানে চাকরি করতে এসে, স্বার্থ ও সমৃদ্ধির স্বরূপ ও প্রক্রিয়া দেখে পুতন বুঝেছে যে, নিজের ভালো করতে গেলে পরের মন্দ করতে দুবার ভাবলে চলে না। অত যারা ভাবে, তাদের সুখী হওয়া এই জীবনে আর হয়ে ওঠে না।

মায়ের সঙ্গে বাবা শুয়েছিল, দুজনে দুজনকে এনজয় করেছিল, তাই পুতন জন্মেছিল। তার মায়ের প্রতি পুতনের বিশেষ দায়দায়িত্ব ত থাকার কথা নয়।

বসে বসে খাও না। অমন পায়চারি করার দরকার কী?

পুতন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, রাজেনকে।

রাজেন বলল, বসে বসে মাল খাওয়া মানা। সায়েবরা কী বলে জানিসনি? বলে "হাউ মেনি ড্রিঙ্কস ক্যান উ্য স্ট্যান্ড?" যদি মাল বসে বসেই খাওয়ার ছেলো, তালে তো বলতেই পাতো "হাউ মেনি ড্রিংকস ক্যান উ্য সিট?" হুঁ। হুঁ। তা কি তারা বলেচে? এ কতাও আমার গুরুর কাছ থেকে শোনা। হুঁ বাবা! সায়েবদের সবসময়ই আমি মেনে চলি। সায়েবদের পায়ে জুতো পরিয়ে, তেল মাকিয়ে, আমার মোমের পুতুল ঠাকমাকে, পালকি করে সায়েবকে দিয়ে ব্রীডিং করাবার জন্যে ঠাকুদ্দা পাইটেচেলো। এমনিতে কি আর আমার গায়ের রঙ এমন সায়েবের মতো? সায়েব দিয়ে একবার করিয়ে নেওয়ায়, পুরো গুষ্ঠি কেমন ফর্সা বনে গেছে বলো। আমার জ্যাটার মাথার চুলও কটা রঙ। জ্যাটাকে পাড়ার লোকে শুধোতো, এই যে হরেন। মাকে শুধিওতো, ব্যাপারখানা কী?

জ্যাটা চটে গিয়ে বলত, তোদের মায়েরা সেকেনে গিয়ে পালঙ্কের উপরে কেলিয়ে শুলেও সায়েব তাদের ইয়েতে মুতেও দিতোনা। বুয়েচিস্‌।

হ্যাঁ। কতা কইতো বটে বাবা। বাবার কতার সামনে কোনো শালার দাঁড়াবার জো টি ছিল না। মিত্যে কতাও বলতে পারত অনগগল, চোখের পাতা একটুও না-কাঁপিয়ে। ভালো উকিল হবার সবরকম গুণই ছেলো। কিন্তু হল না কিছুই।

কী করতেন তোমার বাবা?

জিগেস করল, রাজেন।

তুমি হলে, আমার এক বোতলের স্যাঙাৎ। তোমাকে ভাই বলতে বাধা নেই। অনেক কিছুই হত। তবে, শখ হিসেবে, মেয়ের দালালিও করত কখনো সখনো বলে শুনিচি। তা বলে, সোনাগাচির মেয়ে নয়। বড় ঘরের সব ফাস্টোকেলাস মাল। সাপ্লাই করত সাহেব সুবোদের, তারপর দিশি সায়েবদের, ব্যাবসাদার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো দিল্লীই চলে গেসল। মাইরি! সুখ কত্তে হয়, ত দিল্লী চলো। কোটি কোটি টাকার ডীল হচ্ছে সেকেনে। মেয়েচেলে একহাতে দাও আর অন্যহাতে কনট্রাক্ট নাও; লাইসেন্স নাও। পেটে খাওয়া, জামাকাপড় পরা, মদ খাওয়াও সবই একসময় এসে 'বাস্‌' করতেই হয়। কিন্তু বিধাতা এই যে হাড়বিহীন ওয়ান্ডারফুল গুণী যন্তরটি দিয়েচে মাইরি সব পুরুষকে, এর গুণ হচ্চে বিদ্যেরই মতো। কজন পুরুষ শালা এই যন্ত্রের প্রপার ইভ্যালুয়েশন করল। শুধু বংশ রক্ষা করেই রিটায়ার করিয়ে দেয় নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট পুরুষ। এর ভার্সেটাইলিটি সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে? কজনের আছে?

পুতনও, রাজনের এমন জ্বালাময়ী ভাষণে একটু ঘাবড়ে গিয়ে শুধোল, বিদ্যেরই মতন মানে। মানে কী?

মানে, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।

পুতন হেসে ফেলল, ওর কথা শুনে।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কী ভাষা। কী সব আলোচনা! কিরণশশীর ছেলে সে। গরিব তারা হতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্তর সব শালীনতা সভ্যতার গুণ তার মধ্যে তখনও কুঁই-কুঁই করে হলেও একটুখানি বেঁচে ছিল। শিলির প্রেমিক ছিল সে। লেবুপাতার গন্ধ ছিল সেই প্রেমে, বৈশাখের ভোরের হাওয়ার পরশ ছিল। সব গোলমাল হয়ে গেল। তার চাকরি, তার ম্যানেজারের আত্মীয়কে খুশি করা, এসব কি চাকরির উন্নতির জন্যেই করতে হত? মাইনে একটু কম থাকলেই বা কী ক্ষতি হত?

এই কথা মনে হতেই তার মাথার মধ্যে কে যেন গমগম করে বলে উঠল ধুলাবাড়ি! ধুলাবাড়ি।

কত কী ইলেকট্রিকাল গুডস, কত সুগন্ধ, কত আরাম-বিলাসের উপকরণ, কত রঙিন নাইলনের প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, কতরকম হুইস্কি। না, না। উন্নতি তাকে করতেই হবে। পেছনে ফেরার উপায় নেই কোনোই। আত্মিক উন্নতি-ফুন্নতি বোকাদের ডিকশনারিতেই পাওয়া যায়। এখন আর্থিক উন্নতিই হচ্ছে একজন মানুষের পরম কামনা। যার অর্থ আছে আজ, তার সবই আছে। যার দুনম্বর অর্থ আছে, তার সবেরও বেশি আছে। সেই রাজা। দণ্ডমুণ্ডের বাপ। সেই এক নম্বর দুনম্বর মান যে-কোনো ফেরেলবাজি করেই, চুরি জোচ্চুরি, স্মাগলিং করেই এককাট্টা করা হোক না কেন! একবার পকেটে ঢুকে এলেই বাসস্।

রাজেন বলল, জিনিসটি কিমতি হবে।

বলেই বলল, কিন্তু কেন বলতো গুরু?

পুতনের ভয় ভয় করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই, একটু শীত শীতও। ও তুতলে বলল, কে-কে-কেন?

নোন্‌তা বলে। আর কেন! শালা মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। একটু নিমকিন না হলে; বলেই, গোড়ালির উপর দু-পাক ঘুরে নেচে নিয়ে বলল, নিমকিন না হলে জমে না। নোনতা স্বাদ হচ্ছে দুনিয়ার সেরা স্বাদ। পৃথিবীর সব সেরা জিনিসের স্বাদই নোনতা।

বলেই, গলা ছেড়ে গান ধরে দিল, নিজের পেছনে তাল ঠুকে, খেমটার সুরে।

"বল, গোলাপ মোরে বল, তুই ফুটিবি কবে সখী, বল্ গোলাপ মোরে বল্"...

গান থামিয়েই বলল, কার গান বলো তো গুরু?

পুতন গান-ফান বিশেষ জানে না, শোনেওনি। শুনেছে ওই শিলিরই কাছে যা একটু-আধটু। তাই চুপ করেই থাকল।

তুমি কী ভাবছ? গহরজানের?

রাজেন নিজেই বলল আবার।

কে গহরজান?

গহরজানের নাম শোননি। কী হে তুমি! তুমি একটি মাল! ছ্যাঃ! যাকগে তার কথা বলতে বসলে রাত পোয়াবে। আম্মো অবশ্য তাকে চোকে দেকিনি। কাকা-জ্যাটাদের কাছে শুনিচি। কিন্তু এ গান গহরজান বাঈজিরও নয়।

তো কার?

আমাদেরই পাড়ার এক লোকের লেখা।

সে কে? তোমাদের পাড়ার মানে?

জোড়াসাঁকোর। রবীন্দ্রনাথ টেগোরের।

আলোকঝারিতে বিকেলে গেছিল পরেশ, বন্দুকটাকে কাঁধে নিয়ে। কাল রাতে পুতন আর পুতনের বন্ধু রাজেনকে খেতে বলেছে, গদাইকেও বলেছে, দাদা নরেশ। যদি মুরগি অথবা কোটরা হরিণ পায় তো ভালো হয়। পাঁঠা আর হাঁস-মুরগির মাংস তো ওরা রোজই খায়। বুনো মোরগ অথবা হরিণ খাওয়াতে পারলে, সস্তাও পড়ে। তাছাড়া, ওরাও নিশ্চয়ই খুশি হবে। শহরের লোক রাজেন তো বুনো পশু-পাখির স্বাদই জানে না।

বেলা হয়েছে, কিন্তু সন্ধে হতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি। সাইকেলটা রেখে এসেছে টুঙ বাগানের মধ্যেই। হরিণ পেলে, সঙ্গে কাউকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। মুরগি পেলে তো সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। অসুবিধে নেই কোনোই।

পাহাড়ে কিছুটা চড়েই, নালাটার মধ্যে নেমে এল পরেশ। নালার শুকনো বালিতে জানোয়ারদের পায়ের দাগ পাবেই। তারপর ঠিক করবে কী করবে, না করবে।

নালাটায় নামবার সময়েই ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওকে হঠাৎই সাবধান হতে বলল। এরকম হয় কখনো কখনো। কী করে হয়, তা ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। কিন্তু হয়।

নালাটাতে নেমে একটু এগোতেই পরেশ দেখল মস্ত একটি মাদীন বাঘের পায়ের দাগ। চিতা নয়, বড় বাঘ। একেবারেই টাটকা। কিছুক্ষণ আগেই বাঘিনি গেছে শুকিয়ে-যাওয়া নদীর বালি-রেখা ধরে।

মন খুবই খারাপ হয়ে গেল পরেশের। বাঘ যখন মারতে চায় না, তখনই বাঘের খোঁজ পায়। আর যখন চায়, তখন জঙ্গল হাঁকা করলেও টিকি দেখা যায় না। আজ ওর মন ওসব ঝামেলা-ঝক্কিতে যেতে চায় না। বাঘের মোকাবিলার মতো মন নিয়ে আজ বিকেলে ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি আদৌ।

তবুও, সাবধানের মার নেই। যে জঙ্গলে বিপজ্জনক জানোয়ার থাকতে পারে বলে মনে হয়, সেখানে ঢুকলে বন্দুকের ডান দিকের ব্যারেলে সবসময়ই এল.জি.রাখে, ছাত্তারের কথা মতো। কখন যে "ইমার্জেন্সি" হয়, কে বলতে পারে? কিন্তু এখন তো সম্ভাব্যতার কথা নয়, বাঘ যে আছেই, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাই কোনো ঝুঁকি না নিয়ে, এক ব্যারেলে বুলেট আর অন্য ব্যারেলে এল.জি.পুরল। হরিণও মারা যাবে এল.জি. দিয়ে। দূরে থাকলে বলও চালাতে পারে।

এই শুকনো নালাটার মধ্যে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেই একটি দোলামতো জায়গা আছে, ও জানে। তাতে মে মাসের শেষেও জল থাকে। ঐখানে পৌঁছে, ওই জলের পাশে, কোনো গাছের উপরে উঠে বসে থাকলে কোনো-না-কোনো জানোয়ারের দেখা যে পাবেই, সে কথা ও জানত। মুরগি, ময়ূরও জল খেতে আসবেই। শুয়োরও আসবে তবে শহুরে রাজেন শুয়োর খায় কি না, জানা তো নেই!

তবে বাঘিনি, পরেশের আগে-আগেই গেছে।-পরেশ তার একেবারে পায়ে পায়ে গিয়ে ঘাড়ে চড়তে রাজি নয়। আজকে বাঘিনির মোকাবিলা করতে আদৌ রাজি নয় পরেশ। আজ ওর মনে বাঘ নেই। মনে যেদিন বাঘ না থাকে, সেদিন বাঘের মোকাবিলা করা ঠিকও নয়। বাঘের শিকারে মন যদি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত না থাকে বাঘেরই উপরে, তাহলেই বিপদ। বিষম বিপদ।

কিছুটা এগিয়ে গেলেই ও পৌঁছোবে, নালাটা বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেইখানে ডানদিকে। সাবধানে, শুকনো পাতা এড়িয়ে বাটা-কোম্পানির হান্টার শু পরে বালির উপরে উপরে ও নিঃশব্দে এগোতে লাগল।

কাঠ-ঠোকরা ঠক্‌ঠক্ করে কাঠ ঠুকছে। কাঠবিড়ালি ডাকছে লেজ তুলে তুলে, চিবির-র-র-র, চিরি-র-র-র-র, করে। ময়ূর ডেকে উঠল নালার বাঁদিকের গভীর জঙ্গল থেকে কেঁয়া-আ-আ করে। বনমোরগের একটা মস্ত দল ডানদিকের জঙ্গলের গভীরে ঘুরে ঘুরে পোকা খাচ্ছে। শেষ-বিকেলের আলো লাল-কালো মোরগ আর মুরগিদের গায়ে পড়ে চমকে ঠিকরে যাচ্ছে চারদিকে। মুরগিগুলো স্বগতোক্তি করছে পাতার মধ্যে, পাতা উলটে, পোকামাকড় খুঁটে খেতে খেতে।

বাঘিনি কাছাকাছিই আছে, তাই গুলির শব্দকরা সম্ভব হল না।

আরও একটু এগোতেই, বাঘিনি একবার ডাকল উঁ-আ-ও করে।

এখন বাঘ-বাঘিনির মিলনের সময়। সঙ্গী খুঁজছে বাঘিনি। মেজাজ এখন খিঁচিয়ে আছে তার। রিংকি মেমসাহেবের মতন। এই সময়ে মানুষীরা আর বাঘিনিরা করতে পারে না এমন কম্মো নেই। মানুষ আর বাঘেরা এই সময়ে সাবধান না হলেই বিপদ।

বাঘিনি ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠঠোকরা কাঠ ঠোকা বন্ধ করল।

ময়ুর-মুরগি এবং অন্যান্য সব পাখিরাও হঠাৎ চুপ করে গেল। বনের রানি রোদে বেরিয়েছে। চুপ করে থেকেই তাকে সম্মান জানাতে হয় যে, সেকথা ওরা সকলেই জানে।

বাঘিনি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই এক্কেবারেই "ফ্রিজ" করে গেল পরেশ। একটি খয়ের গাছের আড়াল নিয়ে। পোড়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল বাঘিনিকে। যেদিকে যেতে চায়, যাক।

তারপরই ওর মনে হল, বাঘিনি যদি জল খেয়ে, এই নালা ধরেই ফিরে আসে তাহলে তার মুখোমুখি হতেই হবে। আর মুখোমুখি হতে তো আজকে চায় না পরেশ। তাই, তাড়াতাড়ি নালা ছেড়ে পরেশ বাঁদিকের জঙ্গলে উঠে গেল।

বেলা শেষ হয়েছে। কাল পয়লা বৈশাখ। নববর্ষ। নববর্ষ বলেই নেমন্তন্ন করেছে ওদের। কিছু শিকার না করে নিয়ে গেলেই নয়। বাঘ তো আর খাওয়াতে পারবে না। শালী! বাঘিনি মস্করা করার সময় পেল না আর।

মনে মনে বলল, পরেশ।

পাতা ঝরে গিয়ে গভীর বন এখন ন্যাড়া। যে-সব গাছে পাতা আছে সেই সব গাছেও লালচে হলদেটে পাতারা ফুলেরই মতো ফুটে আছে কালো কালো ডালে, হাওয়ার ছোঁওয়ায় ঝরে যাবার অপেক্ষায়। সামনেই এক দঙ্গল কুঁচফলের ঝাড়। লাল-কালোর দাঙ্গা লাগিয়েছে বনে। নীচে-ন্যাড়া, শালের বন। হাতির কানের মতো পাঁপড় ভাজার মতন মুচমুচে, বড় বড় পাতা ঝরিয়ে দিয়ে সেগুন বন এক আশ্চর্য বিধুর মৌনী ভেক ধরেছে। চৈত্রশেষের আর প্রথম বোশেখের বন, পরেশের মনকে উদাস করে দেয়। কিছুই ভালো লাগে না তার তখন।

কোনো গাছে উঠে বসলে, সেখান থেকে নালাটা ভালো করে ঠাহর করা যায়, তাই ঠাহর করছিল ভালো করে পরেশ, ঠিক সেই সময়ই ওর বাঁ দিকে শুকনো পাতা মচমচিয়ে, কোনো কিছু নড়াচড়া করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খয়ের গাছের পেছন থেকে সরে গিয়ে একটা শিমুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল সেদিকে। চেয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল ও। বাসরে বাস্। শঙ্খচূড় সাপের জোড় লেগেছে। প্রকাণ্ড বড় এক নাগ আর নাগিনি। মাটি থেকে চার পাঁচ ফিট উঁচু হয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে একে অপরকে। হিস্‌হিসানি শোনা যাচ্ছে তাদের।

এই দৃশ্য যে দেখতে পায় সেইই নাকি রাজা হয়। শুনেছে অনেকেরই কাছে।

এবার কি রাজা হবে পরেশ?

নিজেই বলল, নিজেকে, নিরুচ্চারে, ওই দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

এতদিন জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরছে, কিন্তু আগে কখনোই দেখেনি শঙ্খচূড়ের জোড় লাগা।

বন্দুকের বাঁ নল থেকে বলটা বের করে একটা দু-নম্বর ছররা পুরলো তাতে পরেশ। যদি নাগ বা নাগিনি হঠাৎ দেখে ফেলে তাকে, তবে তাদের হাত থেকে বাঁচতে হলে ছররা মারা ছাড়া উপায় নেই। বল বা এল-জি দিয়ে হঠাৎ তেড়ে-আসা সাপকে ঠেকানো মুশকিল।

বন্দুকে ছররা পুরে, সে অনিমেষে নাগ-নাগিনির মিলন দেখতে লাগল। ছাত্তার মিঞার ভাষাতে বললে বলতে হয়, ওর "দিল খুশ" হয়ে গেল।

কেন জানে না, হঠাৎই ওর রিংকি মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে গেল শরীরের মধ্যে সেই ছটফটানিটা হঠাৎ ফিরে এল। পরেশ ভাবছিল বাঘ বা সাপ বা অন্য সব জন্তু জানোয়ারই অন্য লিঙ্গর সঙ্গে মিলিত হয়ই। তারা তাদের মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, না মেয়ের সঙ্গে, তার বাছ-বিচার তারা কখনোই করে না। এই বিচার থাকে কেবল মানুষেরই। শুধুমাত্র মানুষই মিলিত হয় না যন্ত্রের মতো, স্বজাতের যে-কোনো স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে। এবং শুধুমাত্র দু'একজন মানুষই পারে, অথবা অবিবাহিত

মানুষই পারে, না মিলিত হয়ে থাকতে। যেমন, পরেশ পেরেছে। মিলনের সঙ্গী, নিজের মনমতো পছন্দ করা শুধুমাত্র মানুষেরই ধর্ম। এই পছন্দের পেছনে নানারকম সামাজিক এবং বিবেকজাত বাধাও থাকে। পছন্দ না হলে, সমাজের অনুমোদন না পেলে সারাজীবন একা একাই একজন মানুষ কাটিয়ে দিতে পারে, দেয়ও তো সত্যিই! কত পুরুষ ও নারীও!

সেই মুহূর্তে, ও যে মানুষ হয়ে জন্মেছে, কোনো মনুষ্যেতের জীব হয়ে নয়; এই কথাটা নতুন করে জেনে খুবই ভালো লাগল পরেশের। এই একাকিত্বর আনন্দ এবং যন্ত্রণা শুধুমাত্র মানুষেরই যে একার। অন্য প্রাণীরা এই তীব্র আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই যে করতে পারে না। মেসিনের মতো তারা খায়, ঘুমোয়, জোড় লাগে, বংশবৃদ্ধি করে; তারপর একদিন মরে যায়। বেশি সময়েই তারা মরে, অন্যের খাদ্য হয়ে। কম সময়েই মানুষের মতো অসুখ-বিসুখে মৃত্যু হয় ওদের। জন্মায় অলক্ষ্যে যেমন, হঠাৎ করে; চলেও যায়, তেমনই করে।

একদৃষ্টে, জোড়া-লাগা নাগেদের দিকে চেয়েছিল পরেশ। এমন সময় ওর মনে হল ওকে কেউ দেখছে পেছন থেকে।

জঙ্গলে নড়াচড়া, কখনোই হঠাৎ করতে নেই। হঠাৎ ঘাড়-ঘোরাতে গেলে ঘাড়টিই খুইয়ে বসতে হয়। তাই খুব সন্তর্পণে পরেশ শরীর না ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়টাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল দুই গোড়ালির উপরে পা রেখে। আধখানাও ঘোরেনি, তখুনি তার চোখের কোণায় সে দেখতে পেল বাঘিনি নালার মধ্যে দাঁড়িয়ে জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়াল থেকে মুখ তুলে; একদৃষ্টে তাকে দেখছে নিশ্চল হয়ে।

বাঘিনিকে দেখতে পাওয়া মাত্র পরেশও স্থাণুরই মতো নিশ্চল হয়ে রইল। বাঁ চোখের কোণে বাঘিনিকে নজর করতে লাগল সাবধানে একটুও নড়াচড়া না করে।

চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না আর। পুরো দুটি মিনিট বাঘিনি তাকে দেখল। তারপরই জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালেই চলতে শুরু করল নালার মধ্যে মধ্যে। শেষ সূর্যের সোনা আলো, সেই ঝাড় ও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা-যাওয়া তার বাদামি-লাল-আর কালো ডোরাকাটা-সাদার ছোপলাগা শরীরে পড়ে তাকে যেন আরও জমকালো করে তুলল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার হেলতে-দুলতে যাওয়া শরীর, নালার অন্য প্রান্তে।

বাঘিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে, পরেশ সাবধানে, জোড়-লাগা নাগ-নাগিনির দৃষ্টি এড়িয়ে, নালায় নামল এসে। তারপর চলতে লাগল জলের দিকে। যেখান থেকে বাঘিনি সবে জল খেয়ে উঠে গেল।

কে জানে! সে আজ জোড়-লাগার সাথী খুঁজে পাবে কি না।

বাঁকটা নিয়েছে যেই, অমনি দেখে একটা মস্ত শজারু চলেছে জলের দিকে। তাকে দেখেই, বন্দুক তুলল পরেশ। সেও পরেশকে দেখেছিল। দেখেই, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের সাদা সাদা উলের কাঁটার চেয়েও অনেক মোটা আর লম্বা, কাঁটাগুলো ফুলিয়ে সে পিঠ গুটিয়ে গোলাকৃতি হয়ে একটি প্রকাণ্ড সাদা-কালো বলেরই মতো হয়ে গেল। হয়ে গিয়েই, ঝনঝন করে কাঁটা বাজিয়ে গভীর রাতে বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বেঁধে, নির্জন গ্রামের পথে দৌড়ে-যাওয়া ডাক-হরকরারই মতো ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্ আওযাজ তুলে বেগে দৌড়ে এল পরেশরই দিকে। তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য।

পা দুটি শক্ত করে দাঁড়াল পরেশ। খুশিতে ঝলমল করে উঠল ওর মুখ। মনে মনে বলল, আয় শালা! আরও কাছে আয়।

শজারুটি যখন খুবই কাছে এসে পৌঁছল, শেষ মুহূর্তে, হাস্যকর এবং শজারুর পক্ষে লজ্জাকর ভঙ্গিতে ঘুরে সে চলে যেতে চেয়েছিল যদিও পরেশ তখনই ভালো করে নিশানা নিয়ে গুলি করল।

অত কাছ থেকে রোটাক্স-বল-এর থাপ্পড় খেয়ে মুখ থুবড়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল শজারুটা কাঁটা-ছড়িয়ে, দিনশেষের গরম বালি আর নুড়ির উপরে। খানিকক্ষণ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকল। কয়েকফোঁটা রক্ত বেরুল মুখ দিয়ে। ঝুম্‌-ঝুম ফুলিয়ে-তোলা কাটা, তার দম্ভের প্রতীক, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল শায়ীন ওর গায়ের উপরে। তারপর এই জন্মের মতন স্থির হয়ে গেল। প্রবলের হাতে দুর্বল চিরদিনই এমন করেই মরে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কী জঙ্গলে, কী শহরে! কী জানোয়ার, কী মানুষ। শেষাঙ্কটা একইরকম।

পেল্লায় সাইজের, প্রায় মন-খানেক ওজন হবে শজারুটার। ওই কাঁটাসমেত তাকে একা একা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনোমতেই পরেশ। এত বড় শজারু, নিম্ন-আসামের এই অঞ্চলে যে আদৌ আছে, তাও ও জানত না। আবু ছাত্তারকে বলতে হবে।

এখানে এখন তাকে রেখে গেলেও, শেয়াল বা হায়নার বা চিতার খাদ্য হয়ে যাবে। ফিরে আসার আগেই তারাই সাবড়ে দেবে পুরোপুরি। নিয়ে যেতে পারলেও নিয়ে গিয়ে লাভ ছিল না কোনো। শজারুর মাংস সকলে ভালোও বাসে না। মাটি-মাটি গন্ধ থাকে একরকম, খরগোশের মাংসর গন্ধর মতো। পরেশ নিজে যদিও ভালোবাসে। শিলিও। দাদা নরেশও শজারু ভালোবেসেই খায়। পুতনও খায় যদিও। আগে তো শজারু, বাড়ির মেয়েরাই মারত কলাগাছ ছুঁড়ে। কলাগাছ গেঁথে যেত কাঁটাতে। দৌড়ে পালাতে পারত না। তারপর অন্যেরা গিয়ে লাঠিপেটা করে শেষ করত।

পুতনের কলকাতার বন্ধু রাজেন হয়তো কোনোদিন শজারু খাওয়া দূরে থাকুক, শজারু কখনো চোখেও দেখেনি, চিড়িয়াখানায় ছাড়া। তার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতাই হবে। এই সব ভেবে, কোমরের বেল্ট থেকে রেমিংটনের ছুরিটা বের করে ওখানেই বসে শজারুটাকে কাটল পরেশ। তারপর সবচেয়ে ভালো জায়গা থেকে সের পাঁচেক মাংসের একটা টুকরো কেটে, তাতে একটা ফুটো করে নিয়ে বন থেকে লতা ছিঁড়ে এনে বেঁধে ডান হাতে ঝুলিয়ে, বাঁ হাতে বন্দুক নিয়ে ফিরে চলল।

এই রকমই হয়। ভাবছিল, শিকার করবে কোটরা হরিণ, ময়ূর, অথবা বনমুরগি। অথচ শিকার হল শজারু। জঙ্গলে এমনই হয়। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না; আর যা না চাওয়া যায়, তাই পাওয়া হয়।

এখানের রকমসকমই সব আলাদা।

সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। উঁচু-নীচু পথ বেয়ে চলেছে পরেশ, টুঙ বাগানের দিকে। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে বসেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে চার পাশ থেকে, একটানা, ঝুমঝুমির মতো। যেন হাজার হাজার শজারু কোন মন্ত্রবলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের গায়ের লক্ষ লক্ষ কাটা বাজাচ্ছে কোন অদৃশ্য শত্রুকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে। এই শেষ বসন্তর আসন্ন সন্ধের বনপথে হাঁটতে হাঁটতে ঝিঁ ঝিঁ-র ডাকের মধ্যে, শিমুলের আর পলাশের ঝিম-ধরা লাল রঙের মধ্যে, কালো পাথর আর লাল-হলুদ শুকনো পাতার রাশ, আর হলুদ, পিছল-পিছল, শুকনো বাঁশপাতার উপরে ভেসে চলতে চলতে নেশা লাগে পরেশের। নেশা বলতে, ওর এইটিই প্রধান। মদ, মাঝে মাঝে খায় বটে ঠিকই; কিন্তু মদ কোনোদিনও ওকে খেতে পারেনি। অথচ এই বন আর পাহাড়, নদী আর বাদার নেশা কিন্তু তাকে খেয়েছে। পুরোপুরিই। সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছে। ঘাড় মটকেছে ওর, বাঘে যেমন হরিণের ঘাড় মটকায়। কোনো মুক্তি নেই পরেশের আর এই জন্মে। এই সুন্দরীর হাতেই সে নিঃশর্তে হত হয়েছে, নিরুপায়ে।

বাড়ি পৌঁছোতেই দাদা নরেশ, শজারুর মাংস দেখে খুশি হল খুবই। এক গোছা শজারুর কাটা এনেছিল পরেশ, শিলির জন্যে। এই কাটা, শখ করে শিলি কখনো কখনো মাথার চুলে গোঁজে। বন্ধুদের দেয়।

জংলি জানোয়ারের মাংস একদিন ঝুলিয়ে রাখলে বা ধুঁয়ো দিয়ে রাখলে নরম হয়। খেতে ভালো লাগে। কিন্তু শিলি বলল, কাকা। আজই ডুমা ডুমা কইর‍্যা কাইট্যা রাখুমানে।

হাত দুটো ধুয়ে এসেই জামা-কাপড় না ছেড়েই বন্দুক পরিষ্কার করছিল বারান্দায় বসে, পরেশ। অন্যঘরের বারান্দায় বসে দাদা নরেশ, ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিল।

ক্লীনিং রড-এর মাথায় শিলির ছেঁড়া শাড়ির নরম টুকরো পেঁচিয়ে থ্রী-ইন-ওয়ান তেল দিয়ে মুছে রাখল এবারে। শুকনো কাপড় দিয়ে আগেই ফোটা কার্তুজের বারুদের ময়লা ঘষে ঘষে তুলেছিল। তারপর ক্লীনিং রড থেকে নোংরা ন্যাকড়া খুলে ফেলে ক্লীনিং-রড ও বন্দুক ঘরে তুলে রেখে সে, চান করতে যাচ্ছিল যখন, তখনই দাদা বলল, বুঝলিরে, ছাত্তার আইছিল।

কখন?

ঘরের দাওয়ার খুঁটি ধরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, পরেশ।

এই, বেলা চারটা নাগাদ হইব।

কইল কী?

কয় নাই কিছু। ত'রে এই খামটা দিয়া গ্যাছে। কইলো, টাকা আছে।

ক্যামেরন সাহেবের কথা কইলো কি কিছু?

পরেশ শুধোল।

হ। কইলো, বাঘ মারাইয়া দিছে তারে ছাত্তারে। সাহেবে নাকি খুশি খুবই।

পরেশের খুবই ইচ্ছে হল, রিংকি মেমসাহেবের কথা জিগগেস করে একবার দাদাকে। ছাত্তার মিঞা কিছু বলেছে কী না, তার সম্বন্ধে? কিন্তু লজ্জায় জিগগেস করতে পারল না।

কেন যে লজ্জা হল নির্লজ্জ পরেশের, ভেবে পেল না।

লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে ইন্দারায় যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও, সেই সময়ে দাদাই আবার বললো রিংকি মেমসাহেবডা কেডা রে?

পরেশ চমকে উঠল।

আবারও লজ্জা হল খুব।

বলল, ক্যামেরন সাহেবের লগে আইছিল শিকার করনের লইগ্যা।

ম্যাম নাকি? দাদা শুধোল।

হ! ম্যামই বটে। তবে বিলাতি না। দিশি ম্যাম।

দিশি ম্যামরাও আবার শিকার করতাছে নাহি আজকাল। আগে তো রাজা-রাজড়ার ঘরের মাইয়ারাই খালি শিকার করত বইল্যা জানি।

আইজকাইল যার ঘরে পয়সা, হেই রাজা-রাজড়া। তাগোই দিন এহন। রাজাদের আর দাম লাই কোনোই। সব, মরা হাতি।

একটু চুপ করে থেকে বলল আবার পরেশ, ছাত্তারে, আর কইলো কী? রিংকি ম্যামসাহেবের কথা?

নারী-বিদ্বেষী পরেশের এই রিংকি ম্যামসাহেবের প্রতি এত ঔৎসুক্যে অবাক হল দাদা নরেশ। পরেশ নিজেও কম হল না।

ও। ভুইল্যাই গেছিলাম গিয়া। ছাত্তারে কইলো, যে তর লইগ্যা একশত টাকা রিংকি ম্যামসাহেবে দিছে। ক্যামেরন সাহেবের টাকার লগেই আছে হেই টাকা। ওই খামেই।

পরেশ কিছু বলতে যাবার আগেই নরেশ বলল, আর তরে একবার দেখাও করতে কইছে সেই ম্যামে।

আমারে? ক্যান? কোনখানে?

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল পরেশ।

আরও কয়দিন ধুবড়িতে থাকব ম্যামে। জিঞ্জিরাম নদীতে যাইব নাকি শুনি। কুমিরের ফোটো তুইলবার লইগ্যা। স্যা নদীটাই বা কোনখানে? নাম শুনি তো নাই কখনো।

নরেশ শুধোল।

পরেশ বলল, স্যা নদী গারো পাহাড়ের কোলে। ছোট্ট, মানে চওড়াতে ছোট্টই নদী, কিন্তু কুমিরে কুমিরে ভরতি। কিন্তু আমারে ডাকে ক্যান ম্যামে? ছাত্তারই তো যথেষ্ট। হ্যা তো আর বাঘ শিকার না, যে দোসর লাগব।

ম্যামেদের কথা, ম্যামেরাই জানে।

দ্ব্যর্থক গলায় বলল, নরেশ।

পরেশ বলল, যাই, চানটা কইরাই আসি। চ্যাট-চ্যাট করতাছে গা ঘামে আর শজারুর রক্তে।

বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। আমগাছে কাক ডাকছে। আর ক'দিন পরেইতো পূর্ণিমা। ইন্দারা থেকে বালতি বালতি জল তুলে ঝুপ্ ঝুপ করে চান করতে লাগল পরেশ।

হাসনুহানা আর বেলফুল ফুটেছে উঠোনে। ওর গায়ে মাখা নিম সাবানের গন্ধের সঙ্গে হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধ মিশে গেল। কিছু হাসনুহানা কেটে দিতে হবে। সাপ আসে, হাসনুহানার তীব্র গন্ধে।

পরেশ ভাবছিল যে, এই জ্যোৎস্না রাতের গায়েও এক ধরনের গন্ধ আছে, মেঠো ইঁদুরের গন্ধের মতো, বছরের এই সময়ের রাতে লিচু গাছে গাছে লিচু-খেয়ে-বেড়ানো বাদুড়ের গায়ের গন্ধের মতো। গ্রামের গায়ে এক-রকমের গন্ধ; বনের গায়ে অন্যরকমের। এই চাঁদনী রাতও কতরকম গন্ধের কারবার করে। এই জ্যোৎস্না-রাতও যেন আর-এক সাদা দাড়িওয়ালা মুসলমান আতরওয়ালা। রিংকি মেমসাহেবের গায়ের গন্ধের সঙ্গে যেমন শিলির গায়ের গন্ধের মিল নেই, তেমন শিলির গায়ের গন্ধের সঙ্গে আবার আলোকঝারি পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছুনো পর্বতজুয়ারের মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধের মিল নেই। যেমন জিঞ্জিরাম নদীর পারে দাঁড়িয়ে-থাকা গারো বা রাভা মেয়েদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধেরও মিল নেই। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক মেয়ের গায়ের গন্ধ আলাদা। কোনো মেয়ের খুব কাছে না এসেও পরেশ জানে তা। নদীর গন্ধেরই মতো, মেয়েদের গায়ের গন্ধও দূর থেকে পায় ও।

হাওয়ায়, আর বৃষ্টিতে, জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায়, ভেসে আসে সেই গন্ধ।

কোয়াক। কোয়াক। কোয়াক করে, গম্ভীর গলায় মন খারাপ করা ডাক ডাকতে ডাকতে একদল কেশর-ওয়ালা লম্বা-ঠ্যাং-এর সরু-গলা সাদা পাখি উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে, ময়নামারীর বিলের দিকে। আলোকঝারি পাহাড় থেকেই এল ওরা। ছাত্তার বলছিল, এই বকগুলোর ইংরিজি নাম নাকি "হেরন।"

ভালো করে সাবান মেখে, আবার জল ঢেলে ঢেলে হাপুস হুপুস করে চান করতে করতে পরেশ গায়ে সেই জ্বালাটা আবারও অনুভব করল। সেই যমদুয়ারের মাচায় বসে, রিংকি মেমসাহেবের কাছে থাকার সময়ে, যেমন হয়েছিল। গা-ছমছম করে উঠল বীর শিকারির। তাকে ডেকেছে কেন রিংকি মেমসাহেব কে জানে? নিশির ডাকের মতোই সেই নিরুচ্চারিত ডাক তার বুকে এক অনামা ভয় জাগিয়ে তুলল। তাড়াতাড়ি, শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছে, ভেজা গামছা ছেড়ে ফেলে, লুঙ্গিটা পরে ফেলল পরেশ। এই জ্যোৎস্নামাখা উদোম রাতে, একমুহূর্ত উদোম থাকলেই গা-শিরশির করে পরেশের। বিয়ে-করা মানুষ ও মানুষীরা অনেক সহজেই বোধহয় নিজেদের নগ্নতাকে মেনে নিতে

শিখে যায়। নগ্নতাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা। বিয়ে না-করা লোকেরা পারে না। মুহূর্তের জন্যে নগ্ন হলেও হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে যাওয়া বুনো শজারুর মতোই তাদের গায়ের সবকটি অদৃশ্য কাঁটা ঝমঝম করে বাজতে থাকে, গা-ময় কাঁটারই মতো, লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

এই চাঁদের রাত, হাসনুহানার গন্ধ, রাত পাখির ডাক আর নিজের ক্ষণিক নগ্নতা মিলে-মিশে, গোঁড়, গেঁয়ো, আনপড় পরেশকে তারা যেন হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় এক অচেনা-পুরের দিকে। রিংকি মেমসাহেবের কথা ভাবলেই সে যেন এখনও কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। পরেশ ভাবে, পরেশও কি কোনোদিন তার এতোদিনের নারীবিদ্বেষ মুছে ফেলে অন্য দশজন ল্যাজে-গোবরে পুরুষমানুষের মতো, আবু ছাত্তারেরই মতো, "কাবিন নামাহ্"তে সই করে বিবি আর আওলাদ নিয়ে ঘর করবে? জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে?

এখন যে বড় তাপের সময়। শরীরে তাপ, সংসারে তাপ; বাজারে তাপ। ঘর বাঁধার মতো ভুল প্রথম যৌবনের অবুঝ উচ্ছ্বাসেই করা যায়, এখন আর তা হয় না। "কাবিন নিমাহ্"র ওয়াক্ত চলে গেছে। এখন প্রত্যেক মানুষ ও মানুষী স্বরাট সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী। মেয়েরাই বোরখা আর পরতে চাইছে না। "নিকাহ্" করে সারাজীবন বেঁধে রাখতে চাইছে না তারাও আর নিজেদের, অন্য কোনোই পুরুষ গাধা-বোটের সঙ্গে।

জীবনের মানে ভেসে-যাওয়া, নদীর নিত্য নতুন বাঁকের নিত্য নতুন চমকের সৌন্দর্যর শিহরণে মুহুর্মুহু শিহরিত হতে থাকারই অভিজ্ঞতা। বিয়ে বা "নিকাহ"।

সামাজিক বা শারীরিক প্রয়োজনীয়তা হয়তো ছিল পাঁচশো বছর আগেও। আজকে এই পুতুলখেলার কোনো অবকাশই নেই। অন্তত পরেশের কাছে। বিয়ে না-করা মানুষ, পরেশের মতো, রিংকি মেমসাহেবের মতো, বিয়ে-করা মানুষদের চেয়ে অনেকই বেশি স্বাধীন। এবং খুশিও। তারা নিজেদের জন্যেই বাঁচে জীবনে, বিবি আর একপাল বাচ্চাদের নিয়ে হিমসিম হয়ে এই একটামাত্র জীবন, জীবনের মধ্যে থেবড়ে বসে, তাদের জীবনের মাছি ভন ভন আঠালো মুহূর্তগুলিকে কাঁঠালের প্যাতপ্যাতে কোয়ার মতো নেড়ে চেড়ে, জীবনের মেয়াদ শেষ করে যায় না।

সেই জীবন, এক একঘেয়ে রিক্ত রিয়াজের জীবন, সে জীবন কোনোদিনও "বন্দেগী" হয়ে ওঠে না।

না, না। পরেশ অমন ভুল করবে না।

রিংকি মেমসাহেবের কথা ভেবে, তার যতই রিকিাঝকি হোক না কেন শরীরে।

এতো ভালো ভালো কথা পরেশ মুখে হয়তো বলে না, কিন্তু তার মাথার মধ্যে যে ভাবনার অনুরণন ওঠে, তা ভালো ভালো শব্দে প্রকাশ করলে হয়তো এই রকমই শোনাত।

এ জন্মে হল না। অনেক কিছুই হল না। পরের জন্মে, ভালো করে লেখাপড়া শিখবে পরেশ। অনেক বড়লোক হবে। ক্যামেরন সাহেবদের সমাজের কোরকের গন্ধ নেবে নাকে। মস্ত্ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ।

পরের জন্মে।

আজ পুতন এবং তার বন্ধু রাজেন খাবে।

সকাল থেকে শিলি রান্নাঘরেই আছে। শহরের ছেলেকে গ্রামের রান্না খাওয়াব, বলেছে পরেশ। কুঁচো মাছ ভাজা। শিঙ্গি-বেগুন-আলু-পেয়াজ-কাঁচালঙ্কার রসা, চিতলের পেটি, ধুবড়ি থেকে আনিয়েছে পরেশ, বাস-ড্রাইভারকে দিয়ে। রান্না করছে শিলি, ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে। কাঁটালের বিচিভাজা। বড় বড় কইয়ের হরগৌরী। একপাশে মিষ্টি, অন্য পাশে ঝাল। চালতার আর করমচার টক। মধুদার

দোকানের রসগোল্লা। আর ঘন করে জ্বাল-দেওয়া দুধের লাল-থকথকে পায়েস। সেদ্ধ চালের। কিরণশশীকেও খেতে বলেছে রাতে শিলি। বুড়ির জন্যে লুচি করে দেবে ক'খানা। কুমড়ো, আলু আর ছোলার তরকারি করবে। নিরামিষ। পায়েস তো আছেই। গদাইও আসবে।

এতদিন গদাইকে সহ্য করতে পারত না শিলি। বদলে-যাওয়া পুতন আর তার বন্ধু রাজেনকে দেখার পর থেকে গদাইকে অতখানি খারাপ আর লাগে না। যাই হোক, গদাই গ্রামের ছেলে। শিলি ওকে তবু বোঝে। ওদের বোঝে না। পুতন এতটাই বদলে ফেলেছে নিজেকে যে, তাকেও প্রায় অচেনা বলেই ঠেকছে শিলির চোখে।

রাজেন ছেলেটার চোখের দৃষ্টির মধ্যেই দারুণ এক অভব্যতা আছে। শিলিকে নদীপারে নগ্ন দেখার পরও গদাই-এর চোখে এমন বিচ্ছিরি কদর্য দৃষ্টি ছিল না। জানে শিলি।

রাজেনের দুটি চোখের যেন অনেকগুলো অসভ্য হাতও আছে। মাকড়সার হাতের মতো রোমশ, গা ঘিন-ঘিন হাত। তার চোখের যে অদৃশ্য হাত দুটি দিয়ে ও শিলিকে চকিতে নগ্ন করে ফেলে, তার সমস্ত লজ্জাস্থানই যেন অসভ্যর মতো অধৈর্যে স্পর্শ করে।

রাজেন ওর দিকে তাকালেই ভীষণই অস্বস্তি বোধ করে শিলি। ভীষণ খারাপ লাগতে থাকে। নরকের কীট ও একটি। ওই রাজেন।

কাকা ওকে খেতে বলাতে তবু আপত্তি করেনি শিলি। কারণ, বাবা ও কাকার মুখের উপর কিছু বলার মতো শিক্ষা ও পায়নি। রাজেনের জন্যেই এত-পদ রান্না করতে হবে শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল ও। তবু ভেবেছে, পুতনদার মতি যদি ফেরে। অনেকেই বদলে গেছে তার পুতনদা। মতি আর ফিরবে বলে মনে হয় না। মুখের ভাষায়, ব্যবহারে, পোশাকে-আশাকে, চাউনিতে সেও অন্য এক রাজেন হয়ে উঠেছে। যে পুতনদাকে দেখলেই ভালোলাগায় মরে যেত একদিন, তাকে দেখেই এই কদিন কেমন এক শঙ্কা বোধ করেছে শিলি। খারাপ-লাগা।

একদিন দুপুরে কিরণশশীর কাছে গেছিল শিলি। পুতন আর রাজেন বাড়ি ছিল না। ধুবড়িতে গেছিল সিনেমা দেখতে।

শিলি বলেছিল, কী বুড়ি? ছাওয়াল আইছে বইল্যা কি আমারে ভুইল্যা যাওনটা ঠিক?

কিরণশশীও বদলে গেছেন। এই ক'দিনেই তার চোখ কোটরে বসে গেছে। ছেলে-আসার আনন্দের বদলে এক গভীর ভয় ও শঙ্কা তাকেও ঘিরে রয়েছে।

খুবই লজ্জিত গলায় কিরণশশী বলেছিল, কার ছাওয়াল? পুতন, আমার ছাওয়াল না।

কও কী তুমি? পাগল হইল্যা নাকি?

ঠিকই কই রে শিলি। পুতন আর সেই পুতন নাই। একেবারে গোল্লায় গ্যাছে। আমার সামনেই ছিগারেট খায়, মদ খায়। বোঝছস?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, একদিন তর কাকা পরেশরে কতই কী না কইছি মদ খাওনের লইগ্যা। অথচ ওর কত বয়স হইছে। একদিনও আমারে অসম্মান করে নাই। আমার সামনে কখনো খায় নাই। গাল-মন্দ কইরলে, মাতা নীচু কইর‍্যাই খাড়াইয়া থাকছে। আর বলছে, আমি খারাপ মাসিমা। আমি একটা বকা। বাউন্ডুইল্যা। আমার কথা ছাড়ান দ্যান। বাবা-মায়ের সম্মান কি সব পোলায় রাখে? আমি হইলাম গিয়া আমাগো পরিবারের কুলাঙ্গার।

তাইই কয় নাকি কাকায়?

অবাক গলায় বলেছিল, শিলি।

হ। তাইই তো কইছে চিরডা দিন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আর আমার পুতন? ছিঃ ছিঃ কী ঔদ্ধত্য। কী কম্যু

আর। সঙ্গে ওই এক হারামজাদারে লইয়া আইছে। তরে কী কম্যু আর শিলি! সেদিন হোঁদলের মায়ের বড় মাইয়াডা আইছিলো, মায়ের দেরী হইত্যাছে দেইখ্যা খোঁজ করনের লইগ্যা। ডাগর মাইয়া। ষোলো সতেরো বছর বয়স হইব।

জানি, পাঁচী নাম তো? দেখছি আমি তারে। তা হইছিল কী তাই কও।

শিলি, জিজ্ঞেস করেছিল।

আরে মাইয়াডা যখন ফিইর‍্যা যাইতেছে তখন বাঁশবাগানের মধ্যে তারে এক্কেরে পাইড়া ফ্যালাইছিলো ওই হারামজাদায়। কী লজ্জা! কী লজ্জা! পাঁচী আইয়া আমার কাছে কাইন্দা মরে। ইডা কেমন ভদ্দরলোকের পোলা, ক'তো দেহি? আমি তহনই হারামজাদারে ডাইক্যা কইয়া দিছি যে, পরেশরে কইয়া দিলে পরেশ গুলি কইর‍্যা মাইর‍্যা থুইবে আনে। তার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা নাই কোন। আর যদি কহনও দেহি...

কইতেই আমার পোলার আমার উপর কী গোসসা। সে কয়, তোমার এত্ত বড় সাহস!

কও কী বুড়ি?

বোঝ্‌তেয়। মায়েরে কয় পোলায়! কয়। তুমি আমার অতিথিরে অপমান করো! তোমারে আমি আর এক পয়সাও পাঠাইম্যু না। না-খাইয়া মরণ লাগবো তোমার দেইখআনে। কইয়া দিলাম আজ।

শিলি কাঁদতে থাকা কিরণশশীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি কান্দো ক্যান্ বুড়ি? আমরা তো সবাই আছি নাকি, নাই আমরা? আমরা যদি দুগা খাই, নিজেরা যদি না-খাইয়া না মরি; তয় তোমারেও খাওয়াইমু। পুতনদার মাথাটাই এক্কেরে গ্যাছে গিয়া। ভূত চাপছে মাথায়।

নারে শিলি। মাথা-টাথা যায় নাই। ওডায় এক নম্বরের শয়তান। এক্কেবে ওঁচা হইয়া গেছে। অরে প্যাটে ধরছিলাম ক্যান, তাই ভাইব্যাই ঘেন্না হয় বড়।

ছাড়ান দাও। ছাড়ান দাও। তাছাড়া পুতনদায় তো তোমার একমাত্র পোলা। তারে ফ্যালাইবাই বা কী কইর‍্যা তুমি? পারবা ফ্যালাইতে? শিলি বলেছিল।

কিরণশশীর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল।

বলেছিলেন, পারি কী না দেখিস তুই আমি সব পারি। আমারে তরা অর্ধেক চিনছস। পুরা চিনস নাই। এমন পোলা থাকনের চাইয়া, না থাকনই ঢের ভালো।

শিলি বলেছিল, কাইন্দো না বুড়ি।

কিরণশশী বলেছিলেন, তরে আর পুতনরে লইয়া বুড়া বয়সে সুখে কয়ডা দিন কাটাইম্যু এই স্বপন বুকে লইয়াই এতগুলা বচ্ছর প্রায় না-খাইয়াই কাটাইয়া দিছিরে শিলি! শুধাই কল্পনা আর স্বপ্ন খাইয়াই বাঁচছি। আর...

কাইন্দো না বুড়ি।

শিলির গলা ধরে এসেছিল।

তর কী হইবরে শিলি? ওই হারামজাদায় যে তোরে এমন কইর‍্যা ফ্যালাইয়া দিবে তা আমি জানুম কী কইর‍্যা? ক? তর মতন ভালো, লক্ষ্মী একখান মাইয়া ওই হারামজাদার জীবন সুখে ভইর‍্যা দিতো নে। ছিঃ ছিঃ। কী পোলায় আমার কী হইয়া গেল। শহরে যেন কোন গ্রামের ছাওয়ালরে কেউ না পাঠায় "মানুষ" কইরবার লইগ্যা। কী মানুষই হইল! হায়। হায়।

ছিঃ ছিঃ। কী বল বুড়ি। তোমার একমাত্র সন্তান সে। আর সকলেই তো গ্যাছে গিয়া। পুতনদা ছাড়া তোমার আর তো কেউই নাই। অমন শাপ দিও না তারে। কে কইতে পারে, আবার বদলাইতেও পারে কুনোদিন। কোন কু-দেবতায় ভর করছে তার উপর। তার দৃষ্টি কাইট্যা যাইব গিয়া।

যাউক। যাউক। এও যাউক। আমি অভিশপ্তা। বুঝছস? হতভাগী আমি। কাউরেই লাগব না

আর আমার। গলায় দড়ি দিয়া মইর‍্যা থাকুম এক রাতে। দেখিসানে তুই।

শিলি আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল, বুড়ির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে।

ফেরার পথে, শিলির নিজের দুচোখও জলে ভরে গেছিল। বড় বড় ফোঁটা গাল গড়িয়ে পড়ে, বুকের ব্লাউজের সামনেটা ভিজে গেছিল একেবারে।

কী করবে শিলি? ওর চোখের জল মোছাবার তো কেউই নেই।

সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে গেল ওরা সকলে।

বড় ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে তাকিয়া বের করে দিয়েছিল শিলি।

সন্ধের পর জোর হাওয়া বয় প্রথম বৈশাখে। গরমের 'গ'ও থাকে না। তবুও হাত পাখা দিয়েছিল তিন চারটি। রেকাবিতে মিছরি, জল, পান। বড় বড় কাঁসার গ্লাস। বাবার বিয়ের সময় পাওয়া। এ সবই এক এক করে বের করেছিল শালকাঠের বড় বাক্স থেকে। তেঁতুল দিয়ে মেজেছিল ভালো করে। সেই সব গ্লাসে খোদাই করে লেখা ছিল "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।"

শিলি লক্ষ্য করছিল যে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে কথা বলছিল রাজেন। ইংরিজিতে কথা বলতে পারে এমন বেশি লোক দেখেনি শিলি। কথার মানে না বুঝলেও, অবাক হচ্ছিল।

পুতনদাও মাঝে মাঝেই ইংরিজি শব্দ, এমনকী বাক্যও বলছিল।

সবচেয়ে অবাক হল শিলি গদাইদাকেও কলকাতার সবজান্তা বাবুদের ওই সব রাজনীতি, ফুটবল, সিনেমার আলোচনাতে যোগ দিতে দেখে। গাঁইয়া গদাইও ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে পটাপট ইংরিজি বলছিল দেখে তাজ্জব বনে গেল শিলি।

পুতন ধরল, শিলিকে গান গাইতে হবে।

শিলির খুবই আপত্তি ছিল। কিন্তু পুতনই ঘরে গিয়ে ভাঙা হারমোনিয়ামটাকে বের করে নিয়ে এল। নিয়ে এসে, রাজেনকে দিল।

রাজেন, জ্যাঠার মতো দুটি পান মুখে দিয়ে, হারমোনিয়ামটি নেড়ে চেড়ে সুর বের করল।

বলল, ওবাবা! এ যে দেখি আমাদের ডোয়ার্কিন এন্ড সন্স-এর। কলকাতার?

কাকা বলল, তা বটে। তবে এই হারমোনিয়াম থিক্যা সুরের থিকা ত্যালপোকাই বারাইব বেশি। সাবধানে নাড়া চাড়া করণই ভালো।

হ। ডোয়ার্কিন এন্ড সন্স-এরই বটে!

লজ্জা-মাখা স্মৃতিচারণের সঙ্গে বলেছিলেন নরেশ, শিলির বাবা।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আমার বড় শালা যেবার আইছিলেন, শিলির মায়ের জন্যে লইয়া আইছিলেন।

হারমোনিয়ামটা শিলির দিকে ঠেলে দিয়ে রাজেন বলেছিল, একটা গান হোক।

উঠোনে, কাঁঠালগাছে, লিচুগাছে, গোলাপজামগাছের পাতাতে জ্যোৎস্না চকচক করছিল। ভালো করে চান করে, একটি ফলসা-রঙা খোল আর বেগনে রঙা পাড়ের টাঙ্গাইলের শাড়ি পরা, চোখে কাজল-দেওয়া, শিলিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়ে বোধহয়, ক্যালকাটা কেমিকেলের কান্তা সেন্ট মেখেছিল। কী সাবান, কে জানে? লাক্স কি?

ভাবছিল, রাজেন।

শিলির হাঁটু সমান মিশমিশে কালো চুলে বোধহয় আমলকির তেল দিয়েছিল, চুলের গন্ধ ভাসছিল জ্যোৎস্নাতে। জ্যোৎস্নার গন্ধ, শিলির গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, রাজেনের গায়ের আতরের উগ্র গন্ধ,

হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধে মাতালকরা বৈশাখি হাওয়ায়-ওড়া বাঁশবনের হলুদ পিছল-পিছল ফিনফিনে পাতাদের গন্ধ; সব মিলে মিশে রাত একেবারে গন্ধমাতাল হয়ে উঠেছিল।

চাঁদের আলোয়, গদাই চোরের মতো, শিলির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। হ্যাজাকের আলোতে সবকিছুই বড় বেশি স্পষ্ট দেখায়। কল্পনার কোনো অবকাশই থাকে না সেখানে।

বড় ভালো লাগছে গদাই-এর এই শিলিকে। যদি শিলিকে জীবনে পায়, তবে এমন চাঁদের রাতে, নদীপারের চাপ চাপ নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে একদিন আদর করে দেবে ও! ভালোলাগায় শিলি বলে উঠবে উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।

গদাই মনে মনে বলল, আহা, "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো!"

গদাই-এর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে রাজেন বলল, বুঝেছি। তোমার লজ্জা ভেঙে দেবার জন্যে অন্য কারও গাইতে হবে তোমার আগে। তাই না? জানো, আমার ছোটোপিসির গানের খাতায় আমাদের পাড়ার গোপেন কাকা লিখে দিয়েছিল : "লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু গানের বেলায় নয়।"

গোপেন কাকার "লব" ছিল ছোটোপিসির সঙ্গে।

শিলি লজ্জায় বেগনে হয়ে গেছিল।

এমন সব কথা গুরুজনদের সামনে বলে কী করে লোকটা? কোনো সহবৎই কি শেখেনি এই কলকাতার বাবু?

তারপরই রাজেন বলল, ঠিক আচে। আমিই শুরু করলুম তবে আগে।

বলেই, হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে, শুরু করল :

মাঝে মাঝেই বেলো করা ছেড়ে, বাঁ হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে গাইতে শুরু করল। বাঁ হাত দিয়ে হারমোনিয়ামের উপর তালও দিতে লাগল মধ্যে মধ্যে। গলাটা বেশ ভালো। তবে গায়কীটা কেমন অসভ্য অসভ্য।

"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি,
উড়ে গেলো আর এলো না
'কু' দিয়ে চলে গেলো
কোথায় আমার প্রাণ ময়না!

বলো সখী, কোথা যাবো
কোথা গেলে পাখি পাবো?
পুলিশে কি খবর দেবো
বলো তো, জানাইগে থানায়।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি
উড়ে গেলো আর এলো না।

এমন ধনী কে শহরে?
আমার পাখি রাখলে ধরে
দেকলে পরে, মেরে ধরে
কেড়ে নেবো প্রাণ ময়না।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল গানটা রাজেন।

শিলি অবাক হয়ে গেল। অবাক হল বাবা এবং কাকাও। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসা কিরণশশীও কম অবাক হলেন না।

বড় ভালো গান গায় রাজেন। যেমন গলার স্বর, তেমনই সুরজ্ঞান, তালের উপরও তেমনই দখল।

রাজেনের উপর যত বিরক্তি জমেছিল এ কদিনে দেখে শুনে, সবই যেন এই একটি গান ধুইয়ে দিয়ে গেল। আশ্চর্য। গান, বড় দারুন শখের জিনিস।

বুঝল শিলি।

শিলি ভাবছিল, পৃথিবীতে এমন কোনো লোক বোধহয় নেই, যার সবই দোষ। এই খারাপ মানুষটা যে এত ভালো গান গায় তা বিশ্বাস করতেও মন চায় না। শুধু গানের জন্যেই মানুষটাকে ভালোবাসা যায়। সব কিছুই দেওয়া যায়। যে মেয়েদের মধ্যে সুর আছে, গান আছে, তারাই জানে গানের মহিমা, গানের প্রভাব।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো রাজেনের দিকে চেয়ে রইল শিলি।

নরেশ বললেন, বাঃ বাঃ। এসব গান তুমি শিখলা কার কাছে।

রাজেন বলল, কাকাবাবু, আমাদের পাড়া তো গানেরই পাড়া। বাঈজিদের গান শুনেই তো বড় হয়েছি। তাছাড়া, আমার মামারা সব ছিলেন গানের পোকা। কত সব বড় বড় গাইয়ে আসতেন মামাবাড়িতে। তেলিনীপাড়ার কালোবাবু, কালিপদ পাঠক, গহরজান বাঈজি। মস্ত জমিদার ছিলেন তো মামারা। পায়রা ওড়াতেন, বেড়ালের বে দিতেন। খুবই রমরমা ছিল। হুইস্কি খেয়ে মৌজ হবার পর আলবেলার নল হাত থেকে পড়ে গেলে, চাকরের পুরো নাম ধরে ডেকে কখনো মৌজ নষ্ট করতেন না। বলতেন, রে। রে রে।

অমনি চাকরেরা দৌড়ে এসে, নল তুলে দিত হাতে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি তো আমার পরিবারের কুলাঙ্গার।

হঠাৎই বলল রাজেন কথাটা, হ্যারিকেনের আলোতে শিলির দিকে এক ঝলক চেয়েই।

গানটা ভালো কইর‍্যাই করন উচিত ছিল রাজেন তোমার। বুঝছ। কথায় কয়, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। মামাদের গুণগুলান সবই পাইছ দেহি।

রাজেন হেসে বলল, তা আজ্ঞে। তবে শুধু গুণগুলো পেলেই ভালো হত। শুধু গুণ নয়, দোষগুলোও যে পুরোমাত্রাতেই পেয়েছি। ভালো করে কিছু করা যে আমার চরিত্রেই নেই। আমার মন হচ্ছে, ঘাস ফড়িং-এর মন। চিড়িক চিড়িক করে চমকে চমকে উড়ে বেড়ায়। কোনো কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না। তাইই কিছুই ভালো করে করা হল না। না পড়াশুনো, না গান-বাজনা, না শেয়ার বাজার। আমি একটি ওয়েস্টার। ওয়ার্থলেস। তাই শুধুই লাথি-ঝ্যাঁটা আর অপমানই জুটল কপালে। অবশ্য যার যেমন যোগ্যতা, তেমনই তো হবে প্রাপ্তি।

হেসে, বলল রাজেন।

শিলির কিন্তু মনে হল, যেন কেঁদে বলল।

অনেক হাসির মধ্যেই কান্না থাকে। সকলের চোখে পড়ে না তা।

কথাও কিন্তু চমৎকার বলে রাজেন। শিলি ভাবছিল।

শিলি তো কোন গাঁইয়া অশিক্ষিত মেয়ে। রাজেনের কথা আর গানে ভুলে যাবে পৃথিবীর যে-কোনো রাজকুমারীই। কথা দিয়ে বোধহয় জগৎ মাৎ করা যায়। হয়তো, শুধু কথার কথা হলেও। মনে মনে বলল শিলি, দিয়ে দেবে সহজেই ও রাজেন যা চায়। তাছাড়া ওর যা কিছুই আছে। সে তো

অন্য সব মেয়েরই আছে। বিশেষ কিছু বা বেশি কিন্তু ওর নেই দেমাক করার মতন।

ওর ফুলে, ওর নরম, সবুজ বর্ষা শেষের স্নিগ্ধ মাঠে। একটু বসবে হয়তো তারপরই ঘাসফড়িং আবারও হয়তো উড়ে যাবে অন্যদিকে।

কে জানে, শিলি হয়তো জানে না, কিছু ক্ষণিক মরণ থাকে, যা দারুণ সুখের। সেই ক্ষণিক মরণের গভীর আনন্দর স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনের অনেক দুঃখই হয়তো লাঘব করা যায়। পুতনদাকে আর ভালো লাগছিল না একটুও।

শিলি কেবলই ভাবছিল। ভাবনার যদি পা থাকত, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কত হাজার মাইল যে পরিক্রম করে ফেলত ও, তা সেই জানে। ভাবছিল শিলি, মরারও অনেক রকম থাকে। কিছু কিছু মৃত্যু হয়তো থাকে, যা জীবনের চেয়েও অনেক বেশি প্রার্থনার।

কে জানে? কতটুকুই বা জানে শিলি?

গদাই বলল, এবার শিলির গান হোক একটা। কী বলেন নরেশ কাকু?

রাজেন বলল, নরেশ কিছু বলার আগেই, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

ওঁর গান হবে বলেই ত আমার উপক্রমণিকা। ওঁর গান শুনব বলেই তো বসে আছি। বলেই, হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিতে যেতেই, শিলি বলল, আপনি আরেকটা গান। আপনার এই গানের পর আমার গান হয় না।

সে কী? একটা গান শুনেই। আমি কিন্তু এর চেয়ে ভালো গাই। আজ আমার গলাটা সত্যিই ভালো নেই।

গদাই পাতিহাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, রাজেনকে, খুবই ন্যাকার ঠ্যাকার জানা আছে দেহি আপনের।

"ন্যাকার-ঠ্যাকার" কথাটার মানে?

অবাক হয়ে রাজেন শুধোল।

নরেশ বলল, তুমি চুপ করবা গদাই। ন্যাকার-ঠ্যাকার কারে কয় জানো তুমি?

গদাই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

রাজেন পরিবেশ অপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে কথা ঘুরিয়ে শিলিকে বলল, নাও নাও, তুমি এবার গাও। না গাইলে আমি খাব না কিন্তু এখানে।

আর বলতে হল না শিলিকে। বাড়ির সামনে আলোকঝারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে শূন্য খেতের পর। চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি হয়ে উঠেছে পুরো অঞ্চল। আলোকঝারি দিনের আলোয় সোনাঝুরি, আর অন্ধকারে মিশি-নিশি। ওইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হারমোনিয়ামটাকে কোলের কাছে টেনে নিতে নিতে শিলি নিজেই আলোকঝারি হয়ে উঠল। ওর মনে হল, গানেরই আরেক নাম আলোকঝারি। আজ ওর ভিতরে গান ফুলের মতো ফুটেছে। এক্ষুনি এর সুবাস ছড়িয়ে না দিতে পারলে, নিজ-সুবাসেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে শিলি।

শুরু করল শিলি,

"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।

পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায় শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো॥

তারপর অস্থায়ী, অন্তরা হয়ে সঞ্চারী থেকে আভোগে এসে পৌঁছলো শিলি।

গান শেষ হলে, রাজেন বলল, বাঃ।

একটি মাত্র শব্দ। শুধুই বাঃ।

ওই একটি শব্দ দিয়েই, যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিল রাজেন। হৃদয়-মথিত শব্দ।

শিলি যখন গান গাইছিল, তখন চাঁদের আলোয় বসে পুতন ভাবছিল, ও একাই জানে, এই গান কার উদ্দেশে গাওয়া। শিলি যে পুতনকেই ভালোবাসে, পুতনের অপেক্ষাতেই যে তার সব প্রতীক্ষা, তা রাজেন জানবে কেমন করে? ভালোবাসাতো আর রাতারাতি হয় না।

আর তখন গদাই ভাবছিল, ফুলের বনে কারে ভালো লাগে শিলির তা ওই কলকাতাইয়া বকাটায় জানবো ক্যামনে? কিরণমাসির ছাগল-পুত ওই পুতনেই বা বোঝব ক্যামনে। এই গান গাইল শিলি, হুদা গদারই লইগ্যা।

রাজেন ভাবছিল, সম্পূর্ণই অন্য কথা।

ভাবছিল, বড় হবার পর থেকে মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেকই ঘাঁটাঘাটি ছিনিমিনি করল। মেয়েদের ও যেমন বোঝে, তেমন কম লোকেই বোঝে, এমন একটা ধারণা জন্মে গেছিল ওর। "ভিলেজ-বিউটি" শিলির শরীরটাকেই পেতে চেয়েছিল রাজেন। শিলিকে দেখার পর থেকেই ওকে শারীরিকভাবে পাবার জন্যে তীব্র এক আসক্তি বোধ করছিল। প্রত্যেক শরীরের স্বাদই আলাদা। তাইই তৃপ্তি হয় না কিছুতেই। এত পেয়েও তৃপ্তি হয়নি। সবসময়েই মনে হয়েছে, আরও চাই, নতুন চাই। নতুন প্রক্রিয়াতে চাই। অথচ আজ এই আলোকঝারির পায়ের কাছের গণ্ডগ্রামের চাঁদ-মাখা সন্ধেবেলা কী যে ঘটে গেল হঠাৎ ওর মধ্যে। প্রতিসরিত চাঁদের আলোয় শিলির মুখটিকে দেখে রাজেনের মধ্যে প্রেম কাকে বলে, সেই সম্বন্ধে এই প্রথম যেন এক অনুভব জাগল। এই প্রথম ও জানল কাম শুধু জ্বালাই বাড়ায়, আর প্রেম দেয় স্নিগ্ধতার প্রলেপ। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য গভীর শান্তিকে অনুভব করতে লাগল ও। কারও সামনে বসে থাকলেও যে এতো ভালো লাগতে পারে কখনো, সে সম্বন্ধে সত্যিই ওর কোনো ধারণা ছিল না। ওর সামনে কোনো মেয়ে বসে থাকলেই ওর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে মনে মনে তাকে নিরাবরণ করেই দেখতে ভালোবেসেছে রাজেন এতদিন। কিন্তু আজকের এই শালীন, সুন্দর অনুভূতির শরিক এর আগে সত্যিই কখনো হয়নি। নিজের মধ্যের দুর্বলতায়, নিজের ভঙ্গুরতায়, মুগ্ধতায় বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল রাজেন ক্রমশ নিশ্চুপে।

এমন সময় শিলি বলল, আর একখানা গান কি গাওয়া যায় না?

বাঙাল, গেঁয়ো মেয়েটির সবকিছুই বড় মিষ্টি লাগছে রাজেনের। এমনকী ওই দুর্বোধ্য ভাষাও।

রাজেন বলল, ইনডায়রেক্ট ন্যারেশানে কথা কইলে আমি জবাব দিই না সে কথার। তাছাড়া আমার কি মা-বাবার দেওয়া নাম নেই কোনো?

শিলি হাসল। প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও উঠোনে ও দাওয়ার আলোর প্রতিসরণে শিলির দাঁত ঝিকঝিক করে উঠল।

শিলি বলল, আচ্ছা! আবারও কইতাছি, রাজেনদা আর একখান গান গাইয়া ধন্য করেন আমাগো।

বলেই, হেসে উঠল।

নরেশ এবং পরেশ দুই ভাইই তাদের মেয়ে এবং ভাইঝির হঠাৎ প্রগলভতাতে একটু রুষ্ট হল। কিরণশশী, এই নতুন শিলিকে দূরে বসে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল পুতন। এবং হতাশ হয়েছিল গদাই।

আর কথা না বাড়িয়ে, রাজেন হারমোনিয়ামটাকে টেনে নিয়ে শুরু করল :

"কী হলো আমারো সই বলো কী করি।
নয়ন লাগিল যাহে, কেমন পাসরি।
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন যাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি।"

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিধুবাবুর এই টপ্পাখানি গাইল রাজেন।

এই গানটি তার ছোটমামার কাছে তোলা। এ পর্যন্ত এই গানটি কয়েকশোবার গেয়েছে একা একা, নিজেকে শোনাবার জন্যে এবং অন্যকে ও অন্যদের শোনাবার জন্যেই বেশি। কিন্তু এই গানের বাণীর আসল তাৎপর্য ও যেন এই মুহূর্তে প্রথমবার আবিষ্কার করল। এতদিন টপ্পার কাজের প্রতিই মনোযোগ ছিল বেশি। আজ গানের প্রতিমার শোলার কাজ ছাপিয়ে প্রতিমার পূর্ণ, প্রস্ফুটিত মুখখানি গোচরে এল, মনের অতল গভীর স্পর্শ করল গান রাজেনের জীবনে। গেয়েও যে এতখানি মগ্ন হওয়া যায়, শুধু শুনেই নয়; এই অভিজ্ঞতাও যেন জীবনে এই প্রথম হল।

শিলি স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আরও একঝাঁক "হেরন" কোয়াক কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে চাঁদভাসি রাতের মোহময়তাকে মুহূর্তের জন্যে ছিন্ন করে আলোকঝারির দিক থেকে এসে ময়নামারীর বিলের দিকে চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে চলে গেল। গানের পরের নৈঃশব্দ্য তাদের ক্ষণিক অপার্থিব দূরাগত শব্দে যেন গাঢ়তর হল।

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন।

নৈঃশব্দ্যর চেয়ে বড় গান আর কিছুই নেই। ভাবছিল রাজেন।

সেই ঐশ্বরিক স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতাকে হঠাৎ ধেবড়ে দিয়ে গদাই তার পাতিহাঁসের গলায় বলল, খাইতে দ্যাও শিলি। ক্ষুধা লাগছে বড়। কাল ভোরেই আবার কোকরাঝাড় যাওন লাগব আমার।

পরেশ ও নরেশ দুজনেই বলল, হ। হ। শিলি। এইবারে আস্তে আস্তে জোগাড় যন্তর কর।

কিরণশশী মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে গদাইকে বললেন, সন্ধ্যাকালেই ক্ষুধা লাগে ক্যানরে তর? তুই কি শিশু?

গদাই উত্তর দিল না। ওকে কেউ শিশু বললে ও খুশিই হয়। শিশুরই মতো মুখ হাঁ করল। এমনই করে যে, যে-কোনো সময়েই পোকামাকড় ঢুকে যেতে পারত।

রাজেন ভাবছিল "ক্ষুধা" ওরও পেয়েছে। কিন্তু এই খিদে ভাতের খিদে নয়, নারী শরীরের খিদেও নয়, এমনই এক খিদে, যার বোধ মনে না জাগলে মানুষজন্মই বৃথা। ও মানুষ হয়েই তো জন্মেছিল। জোড়াসাঁকোর রাজেন। আজ ও দ্বিজ হল।

কিরণশশী, হাঁটু মটমটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গাঁটে গাঁটে বড়ই ব্যথা। ধনেশ পাখির দুর্গন্ধ তেল মালিশ করেন। নরেশ, কিরণশশীর জন্যে ধনেশ পাখি মেরে আনে বন পাহাড় খুঁজে।

তারপর স্বগতোক্তি করলেন, যাই। মাইয়াটারে সাহায্য করি গিয়া। এতগুলান পাত, ও একা সামলাইব কী কইর‍্যা?

হাঁসের ঘরে, সেই কথা শুনে, একটা হাঁসী হিসহিস করে উঠল।

গদাই-এর গলার স্বর শুনেও করে থাকতে পারে।

আর ক'দিন বাদেই সাতবোশেখির মেলা। রাজেনকে নিয়ে পুতন বেরিয়েছে সন্ধের পরে চাঁদের আলোতে সাতবোশেখির মেলার পথটি দেখাতে।

কথা হয়েছে, সেদিন ওরা সকলে মিলে একই সঙ্গে যাবে মেলাতে। পুতন, রাজেন, শিলি, চাঁপা, চামেলি, গদাইও।

পরেশ কাকা পরে যাবেন নিজের সময় মতো, সাইকেলে। শিলি এবং অন্যান্য মেয়েরা যাবে গোরুর গাড়িতেই। ছইয়ের নীচে খড় বিছিয়ে, তার উপর শতরঞ্চি পেতে নেবে। আর রাজেন, পুতন, গদাই ওরা সকলে যাবে হেঁটেই।

সেদিন নানারকম মানুষ যাবে পাহাড়ে। রাজবংশী, অহমীয়া, রাভা, মেচ সব নারীরা। বাঙালি বাবুরাও অনেক। বউ-মেয়ে-আন্ডা-বাচ্চা নিয়ে ডিমডুমা চা বাগানের সাঁওতাল কুলিরা। ধুবড়ীর ম্যাচ ফ্যাক্টরির বিহারি কুলিরা। মিশ্র মানুষের পায়ের ধুলোয় বন-পাহাড়ের পথ পাশের গাছ-গাছালি ভরে যাবে। গমগম করবে পথ, মানুষের গলার স্বরে। টুঙ-বাগানে, অভিজ্ঞ মাত্রই জানেন যে, সেদিন সাইকেল লুকিয়ে রেখে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সাইকেল চুরিও হয়ে যেতে পারে।

আলোকঝারি পাহাড়ের দিকেই হাঁটতে গেছিল আজ বিকেলে, রাজেন আর পুতন।

পুতন ভাবছিল, এই রাজেন ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে।

দু'তিনদিন হল একেবারেই বদলে গেছে ও। খায় না, হাসে না. খারাপ খারাপ কথা বলে না, মেয়েদের দিকে রসের চোখে তাকায় না। আশ্চর্য। ড্রিঙ্কও করতে চায় না। শুধুই সিগারেট। খেয়ে যাচ্ছে, একের পর এক।

ওর চোখে এক দারুণ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। বিয়ের পর পর মেয়েদের চোখে যেমন আসে। ওর মনের মধ্যে কী যেন সব ঘটছে। ভাঙচুর। নদীর পাড় ভাঙার মতো। অথচ যে ভাঙাভাঙির আওয়াজ পাশে দাঁড়ানো মানুষও শুনতে পায় না।

পুতন বলছিল, শৈলেন ডাক্তারের কাছেই রাজেনকে নিয়ে যাবে একবার তামাহাটে। নিদেনপক্ষে শৈলেন ডাক্তারের ছোট ভাইকে খবর দিয়ে আনিয়ে একবার দেখিয়ে নেবে ঠিক করল রাজেনকে। কিছু একটা ব্যামো বাধালে বিপদে পড়বে পুতনই।

কেমন দেখলে?

পুতন শুধোল।

উঁ?

অন্যমনস্ক গলায়, রাজেন বলল।

কেমন দেখলে?

পুতন আবারও বলল।

ভালো। পাখিটাতো?

আরে না না। পাখি নয়। আলোকঝারি পাহাড়ে যাওয়ার পথটা কেমন দেখলে?

স্বপ্নোত্থিতর মতো রাজেন বলল, ওঃ। হ্যাঁ। বেশ ভালোই তো! বাঃ! চমৎকার।

আসলে রাজেনের উপরে এই আলোকঝারি পাহাড়, গঙ্গাধর নদী, এই গ্রাম্য এবং বন্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য অজ্ঞাতপূর্ব, অপ্রতিরোধ্য, প্রভাব বিস্তার করেছে। কলকাতার ছেলে। শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গ বলতে ক্বচিৎ বটানিকাল গার্ডেনে যাওয়া আর মাসে একবার দাদু বা মামাদের সঙ্গে গাড়িতে ময়দানে যাওয়াকেই জেনেছে। হর্টিকালচার গার্ডেনেও গেছে অবশ্য বার কয়েক। মামাদের বাগানবাড়িতে।

তারপরেই চা বাগান।

উত্তরবঙ্গর সৌন্দর্যর তুলনা হয় না কোনো। তবে তা তিস্তার উপত্যকার। ওই চা বাগানটা একটি ছোট শহরের লাগোয়া। বড় জঙ্গল বা নদী কাছাকাছি নেই। সোজা লালমাটির বা পিচের পথ,

মাপা-জোঁকা। তার দুপাশে সমান মাপের চা বাগান। সারবদ্ধ কুলি লাইন। বাবু-কোয়ার্টার। অফিসারদের বাংলো। বড় গাছ বলতে, শেড-ট্রিগুলো। প্রকৃতির মধ্যে যে অনিয়মের নিয়ম আছে, অবিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকা দারুণ এক বিন্যাস আছে, তা হঠাৎ করে চোখে পড়ে না কারোই। এখানে এতদিন আসার পরও চোখে পড়েনি রাজেনের। হঠাৎ পড়ল। ওর মনের মধ্যে এই আলোকঝারির আঁচল-ঘেঁষা ছোট গ্রামের প্রভাব তার উপর অনিবার্যভাবেই পড়েছে। শিলির এবং রাত পাখিদের গলার স্বর, বাঁশবনের চৈতি-হাওয়ার কান্না, দিনের বেলাতে আলোকঝারির পাতা-ঝরা বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাওয়া কোটরা হরিণের লালচে-চমক। জুম-চাষের জন্যে পুড়িয়ে-দেওয়া জঙ্গলের প্রান্তবর্তী খেতের সীমানাতে কালো হয়ে যাওয়া পত্রহীন গাছের উপরে লাল-কালো ফুলের মতো সার সার বনমুরগিকে বসে থাকতে দেখা সবই ওর জীবনকে এক নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছে।

গঙ্গাধর নদী বেয়ে চলে যাওয়া পাল-তোলা নৌকোর নিঃশব্দ গতি, উদবেড়ালের বালির পারের গর্ত ছেড়ে হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়া, এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ রাজেনকে এক সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাস-ট্রাম-ঘোড়ারগাড়ির কলকাতায় আশৈশব লালিত হয়েছে বলেই, এই ভিড়ের, ধুলোর ধুঁয়োর পৃথিবীতে এখনও এমন এক আশ্চর্য জগৎও যে বেঁচে আছে; তা ওর জানাই ছিল না।

এসব তো আছেই! তার উপরে শিলি! শিলিকে কতটুকুই বা জেনেছে ও? অথচ তবু, সেই রাতের পর থেকেই, রাজেনের স্বপনে-জাগরণে শুধু মাত্র শিলিই। শিলি ছাড়া আর কেউই নেই। এমনকী বাগবাজারের সোনালি, যার সঙ্গে ওর প্রচণ্ড লদকা-লদকি আছে এবং যে কারণে রাজেনের বাবা সোনালিকে একবার গুম করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, সেও মুছে গেছে মন থেকে ওর।

কলকাতার রাজেন ভাবত, ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানির কাগজ, বাড়ি, ডেইমলার বা ক্যাডিলাক বা রোলস বা মার্সিডিস গাড়িই বুঝি ঐশ্বর্যর একমাত্র সংজ্ঞা। এমন আদিগন্ত আকাশ, এমন সুগন্ধি বাতাস, এমন পাখির স্বর, ফুলের শোভাও, যে কম বড় ঐশ্বর্য নয়, তা ও এখানে এসেই জেনেছে। এই দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা, সরল, সোজা, উচ্চাশাহীন, লোভহীন মানুষগুলোর প্রতি ওর এক আশ্চর্য মমত্ববোধ এবং শ্রদ্ধাও জেগেছে।

এখানে এখনও মানুষের পরিচয় বিত্ত দিয়ে নয়। হৃদয়ের মাপ দিয়ে এখনও মানুষের পরিমাপ হয়। পয়সা ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই যে আছে, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে, সে সম্বন্ধে এখন পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ রাজেন।

বসবে নাকি একটু ওই গুঁড়িটার উপরে? তুমি দেখছি হাঁফিয়ে গেছ!

পুতন বলল, রাজেনকে।

রাজেন কথা না বলে, পথের পাশে ঝড়ে-পড়া একটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসল।

পুতনও বসল পাশে।

হাঁফাচ্ছিল ঠিকই রাজেন, কিন্তু সেটা শুধুই চড়াই ওঠার জন্যে নয়।

দৌড় চলছিল বাইরে নয়, তার মনের মধ্যে। প্রচণ্ড দৌড়। ওর মূল থেকে, জন্মাবধি যে পরিবেশের মধ্যে ও বড় হয়ে উঠেছে সেই পরিবেশ থেকে ও দ্রুত দৌড়ে আসছিল ভিতরে ভিতরে এই নতুন অনাস্বাদিত পরিবেশ ও জীবনের দিকে।

মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কোনো মানুষই। কূপমণ্ডুকতাকেই সুখ বলে জেনে এসেছে তারা, যুগযুগ ধরে। সহজ সুখের, সম্পদের, পুরুষানুক্রমিকভাবে গড়ে-তোলা বিত্তর, প্রতিপত্তির, নিশ্চিন্তির, নির্ভরতার, একঘেয়ে, থিতু, পরিক্রমাহীন জীবনকেই সবচেয়ে বেশি প্রার্থনার বলে জেনে

এসেছিল রাজেন, জীবনের এতগুলো বছর, ওর পূর্বপুরুষদেরই মতন। আজ হঠাৎ স্বেচ্ছায় ছিন্নমূল হতে চাওয়াতে ওর জীবনের গোড়াতেই টান ধরেছে। জীবনের অনেক ছন্দোবদ্ধ ধ্যান-ধারণার অসারতা বা সার সম্বন্ধেও রাজেনের মনে গভীর সব প্রশ্ন জেগেছে। ওর মধ্যে যে এত গভীর ভাবনা ভাবার ক্ষমতা ছিল, সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণা পর্যন্ত ছিল না আগে।

পুতন কুমারগঞ্জের ছেলে। ওও ওর মূল ছিঁড়ে কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার ছেড়ে বেরবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অথচ কত ভিন্ন ওদের দুজনের চাওয়া। ওর পাশে বসেও রাজেনের ভিতরে ভিতরে যে কী হচ্ছে, তা বুঝতে পর্যন্ত পারছে না ও।

জল খাবে নাকি?

পুতন শুধাল রাজেনকে।

রাজেনের মতি-গতি, চোখের ভাব বড় একটা ভালো লাগছিল না পুতনের। রাজেনের জন্যও চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

মুখে কথা না বলে, চোখ দিয়ে রাজেন বলল, পরে।

পুতন বলল, প্ল্যানটা কী করলে রাজেন? সময় তো ফুরিয়ে আসছে। তুমি কি সাতবোশেখির মেলার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যেই শিলিকে জোর করেই? সেদিন পূর্ণিমা। আলো থাকবে কিন্তু অনেক। বন-পাহাড় হাসবে আলোয় আলোয়। আর একটা কথা। তোমাকে যে সুখী করতে পেরেছি, তুমি যে আমার উপরে সন্তুষ্ট, এ কথাটা কিন্তু চা বাগানে ফিরে ম্যানেজারবাবুকে ভালো করে বোল।

রাজেন পূর্ণদৃষ্টি মেলে পুতনের চোখে চাইল।

অনেকক্ষণ ধরে সেই নীরব দৃষ্টি পুতনের চোখের উপরে স্থির হয়ে রইল।

রাজেন মুখে বলল, নিশ্চয়।

পুতন আবারও বলল, বল, রাজেন প্ল্যানটা কী করলে বল?

পুতনের কথাতে এবারে বিরক্ত হল রাজেন। জিভে টাগরা ঠেকিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করল। বিরক্তিসূচক। তারপরই চুপ করে গেল।

উপত্যকা থেকে একটা ময়ূর ডেকে উঠল। তারপরই ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ করে উড়ে এল ওপরে। কিছুটা এসেই, কী যেন একটা গাছে বসল, মস্ত লেজ ঝুলিয়ে। একটা ময়ূর চৈত্রমাসের পূর্ণচাঁদের ঠিক মধ্যিখানে বসেছে, গাছের ডালে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে যেমন দেখা যায়।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও।

রাজেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেদিকে। চিড়িয়াখানার আর মার্বেল প্যালেসে ছাড়া ময়ূর দেখেনি ও কখনো। তার উপরে সত্যিকারের জংলি ময়ূর। ভাবতেই পারছিল না যে, সত্যিই দেখছে। চাঁদের আলোয়, জঙ্গল পাহাড়ের সব কিছুর আলো-ছায়া, হাওয়ায় নড়ানড়ি করা পাতার হাতছানি, আলোছায়ার বুটিকাটা গালচে সবকিছুকেই এমন রূপ যে হয়, তা কি রাজেন জানত। আলোকঝারিতে না এলে, না এলে কুমারগঞ্জে। তথাকথিত শিক্ষাহীন, বি.এ. এম.এ ডিগ্রিহীন শিলির মতন মেয়েও যে হয় তাও কি এই নারীমাংসলোলুপ শহুরে রাজেন জানত? বড়ই রহস্যময় বলে মনে হয়।

অবাক হয়ে, চেয়ে রইল রাজেন। মুগ্ধ চোখে। ঠিক সেই সময়ই বনের গভীর থেকে করাত চেরার আওয়াজের মতন চিতাবাঘ ডেকে উঠল। সমস্ত বন-পাহাড় যেন চিরে চিরে গেল সেই ডাকে। সমস্ত গাছের কোটরে, নদী ও পাতার আর্দ্রতাবাহী অদৃশ্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই আওয়াজ ভরে গেল। ময়ূরটা ভয় পেয়ে ডাল ছেড়ে উড়ল আবার। ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ করে বড় বড় ডানায় আওয়াজ তুলে। তারপর রাতের বনের গভীরে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ ভেঙে-যাওয়া স্বপ্নর মতো।

পুতন বলল, চলো চলো, বাড়ি যাই। বড় বাঘের কাছে তেমন ভয় নেই। এই চিতাগুলোকে

ভরসা নেই। এও তোমার ভাগ্য। সারা জীবন বনে ঘুরেও অনেকের চিতার ডাক শোনা বা চিতাকে দেখার ভাগ্য হয় না। পরেশ কাকাকে বলতে হবে, চিতাটার কথা।

রাজেনের ওই জায়গা ছেড়ে ওঠার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। ময়ূরেরই মতোও চিতা বাঘও ও শুধু চিড়িয়াখানাতেই দেখেছে। ওর কাছে ময়ূরও যা, চিতা বাঘও তা। আরও বিস্ময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি ছিল ও।

কিন্তু চিতা যে কী জিনিস, তা পুতনের ভালো করেই জানা ছিল। ও যখন ছোট তখন তাদের সবচেয়ে ভালো গাই যুঁথীকে নিয়ে যায় এমনই এক চিতাতে, বর্ষার এক বিকেলে। আলোকঝারি পাহাড় আর গ্রামের মাঝের মাঠে চরছিল যুঁথী। তাছাড়া, কালকের হাটে শুনছিল যে, পর্বতজয়ের দিকে একটি মানুষখেকো চিতা এক মেচ-বুড়োকে নিয়ে গেছে। পুতন হঠাৎ উঠে পড়ে রাজেনের হাত ধরে বলল, চলো চলো আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

চোখে ঘোর-লাগা, বিবশ মনের অনিচ্ছুক রাজেন বলল, চলো।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে পুতন বলল, তুমি অনেকই বদলে গেছ রাজেন। জানলে!

হুঁ।

রাজেন বলল।

কিন্তু কেন?

কী জানি!

সত্যি অনেকই বদলে গেছ।

পুতনের কথার কোনো উত্তর দিল না রাজেন।

শিলিকে ভালো লাগেনি তোমার?

হুঁ।

একইভাবে বলল রাজেন।

তবে? তুমি চাও না তাহলে ওকে? নাকি, চাও?

হুঁ!

তুমি চাও ওকে?

পা থামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে রাজেনের মুখে চেয়ে শুধোল, পুতন।

রাজেন উত্তর দিল না কোনো।

মনে মনে বলল, চাওয়ার অনেক রকম আছে পুতন। তুমি সে সব বুঝবে না। এম-কম এ ফার্স্টক্লাস পেলেই মানুষ যে সবই জানবে বা বুঝবে, তার কোনো মানে নেই। আই-এ-এস, আই-পি-এস, সায়ান্টিস্ট, হলেও নয়। ওই সমস্ত বিদ্যা, ডিগ্রি, ওই সমস্ত অর্জন শুধু বাইরে থেকেই দেখা যায়। ডিগ্রির কাগজগুলো পাকিয়ে ঠেসে রাখা যায় আলমারিতে, নিজের গর্বের সঙ্গে; কিন্তু তার বাইরেও অনেক জানা থাকে, তা সেই কৃতীরাও যে জানবেনই, এমন কোনো মানে নেই। এই শিক্ষা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি দিতে পারে না এ। এমনকী যার মধ্যে এই শিক্ষার উন্মেষ হয়, সেও পূর্বমুহূর্তে জানতে পারে না যে, তার মধ্যে তা আছে বা এল। এই সব শিক্ষা জীবনের শিক্ষা, জীবনে চলতে চলতে পাথরের গায়ের শ্যাওলার মতো জন্মায় এ, জীবন থেকেই পাওয়া। যাকে ভালো বাংলাতে বলে জীবনসঞ্জাত।

এসব বই পড়ে জানার নয়।

রাজেন এতদিন নারীঘটিত ব্যাপারের শারীরিক দিকের চরম করেছে বলেই হয়তো আজ ও বুঝতে পারছে যে, মেয়েরাও ওরই মতো মানুষই। নিছকই পুরুষের খেলার বা ভোগের সামগ্রী নয়। এবং

পুরুষের চরম আনন্দ বোধহয় কোনো ঈপ্সিত নারীর মন পাওয়ারই মধ্যে শরীর পাওয়ার মধ্যে আদৌ নয়।

বড়ই লজ্জা হয়েছে রাজেনের। এতদিন এ কথাটাই বুঝতে পারেনি?

ছিঃ। ছিঃ।

এখন শেষ বিকেল। বৈশাখের বিকেল। কালবৈশাখী আসতে পারে আজ। পশ্চিমের আকাশ সাজছে। যদি আসে, তবে কিছু আম গাছের মুকুল আর কিছু গুটি আম ঝরে যাবে। গেলে যাবে। এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে আর কোনো ঔৎসুক্য নেই কিরণশশীর।

কিরণশশী, কুলোতে করে কিসমিস বাছছিলেন। হাঁসগুলো প্যাঁ-অ্যাক, প্যাঁ-অ্যাক করে হরিসভার পুকুর থেকে দিনভর গুগলি আর কুচো মাছ খেয়ে পেট ফুলিয়ে হেলতে-দুলতে উঠোন পেরিয়ে খোপের দিকে ফিরছিল।

ওরা এখুনি খোপে ঢুকবে না। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে গা শুকিয়ে নেবে পড়ন্ত রোদে। ওদের গায়ে জল দাঁড়ায় না। যদিও তলপেট ও ভেতরের দিক ভেজা থাকে। তাছাড়া, সারাদিন জলে থাকায় হিম হয়ে যায় শরীর। কেউ কেউ এক পা তুলে অন্য পাটা পেটের মধ্যে গুঁজে গোল গোল চোখ, আধো বুজে কত কী ভাবে। হাঁসেরা কী ভাবে? কেউ কি জানে?

শিলি এসে এখুনি বসল কিরণশশীর সামনে। রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে।

শিলি বলল, করতাছোটা কী বুড়ি?

পোলাউ রাঁধুম, তাই কিসমিস বাছতাছি।

লিচু গাছে পাখিরা শোর করছে।

এই দুই নারীই নিজের নিজের ভাবনাতে ডুবে রয়েছেন ও রয়েছে। অনুষঙ্গর কোনো প্রভাবই পড়ছে না কারও উপরেই। দূরে, নগেন সেনের বাড়ির খোনা মেয়েটি, পুকুরের দিকে মুখ তুলে হাঁসদের ডাকছে চৈঁ....চৈঁ....চৈঁ....চৈঁ, চৈঁ...। তার নাকিসুরের ডাক এই সন্ধের মুখের বিষণ্ণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। নানারকম আওয়াজ। হাঁসেদের বাড়ি ফেরার ডাক ডাকছে সে, কুলোতে করে ধান নিয়ে, ফলসা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ওঁদের পুকুর থেকে বাড়িতে আসার রাস্তা ওই ফলসাতলা দিয়েই। ডাকছে, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ, চৈঁ,...।

এই সব শব্দসমষ্টির ঝুমঝুমির মধ্যে বুঁদ হয়ে যায় শিলি।

মসজিদের আহ্বান ভেসে আসছে। মকবুল চাচা মগরীবের নামাজে বসেছেন। ওদের বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আসার সময়ে একটু আগেই দেখে এসেছে শিলি।

খবদ্দার!

বলেই, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল। একেবারে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

দুজনেই চমকে উঠলেন ওঁরা। অলিমুদ্দির; চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ হাঁক। রমজান মিঞার ছোট ছাওয়াল কখন যে এসেছে, তা ওঁরা দেখেনইনি।

অলিমুদ্দি ঝুড়ি নামাল উঠোনে। ঝুড়ি নামিয়ে, গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলল, বড়ই মেহনত গ্যাছে আজ সারাটা দিন। বোঝলা দিদি।

ওর লাল-হওয়া মুখের দিকে চেয়ে শিলি বলল, হ। তাইত দ্যাখতাছি। জল খাবা নাকি এট্টু? তা মেহনত তোমার কোনদিন যায় না তাই কও দেহি।

তা দিদি যা কইছ। ওই তুমি যা এই মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝলা। আর কেউই বোঝে না।

শিলি হাসল।

বলল, আমিই হইল্যাম গিয়া কুমারগঞ্জের "বুঝী" মা। কী কইস?

পানি? পাইলে তো খুবই ভালো হয়। পানি আনলা কই?

অলিমুদ্দি বলল।

কিরণশশী বলল, দিবিটা কীসে? জল?

ক্যান? আমি আইন্যা দিতাছি। রান্নাঘরে গ্লাস আছে তো না কি?

নমঃশুদ্দুর আর মোছলমানদের গ্লাস নাই।

ছিঃ। ছিঃ।

বলল, শিলি।

আলিমুদ্দির পরিশ্রমে লাল-হওয়া মুখ আরও লাল হয়ে যায়।

শিলি বলে, আমি এই আইতাছি। তুমি খাড়াও দেহি এক মিনিট আলিমুদ্দি।

বলেই, আঁচল উড়িয়ে দৌড়ে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পেতলের রেকাবিতে ওর নিজের হাতে তৈরি কাঁচাগোল্লা আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। কাঁচাগোল্লার রেকাবিটা আলিমুদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ধরো।

আমি পানি আইন্যা দিতেছি তোমারে।

বলেই, কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, মাছ পাইল্যা কি আজ, তাই কও। বুড়ি হক্কলরে দাওয়াত্ দিছে তো।

কথাটা বলেই, লজ্জা পেয়ে গেল।

আলিমুদ্দি, যে নিজে হাতে সারা দুপুর পোলো দিয়ে দিয়ে বৈশাখের খর রোদে, পুকুরে আর বিলে মাছ ধরে আনল কিরণশশীর নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানোর জন্যে, সেই নিজে কোনোদিনও একটু জল খেতে পারবে না এ বাড়িতে? ওর সামনে, কিরণশশীর দাওয়াতের কথা না বললেই পারত।

ভাবল, শিলি।

আলিমুদ্দি জলের গ্লাসটা নিতে দ্বিধা করছিল।

শিলি বলল। না খাও তো আমার মাথাডা খাও। ছাত্তার চাচায় আমাগো রসুই ঘরে বইস্যা আমাগোর জন্যে মোরগা রান্ধে। বি. এ., এম.এ পাশ করি নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষাও পাই নাই মা-বাপের কাছে। খাও। খাও।

কাঁচাগোল্লা খেয়ে ও যখন জল খাচ্ছে তখন কিরণশশী শিলিকে বললেন, ওই গ্লাসে যেন পুতনরে আবার জল দিস না, হে তগো বাড়ি গ্যালে।

শিলি বিরক্তির গলায় বলল, সে আমি বুঝবনে। তোমার ছাওয়ালে আর আলিমুদ্দিতে ফারাকটা কী? তোমার ছাওয়ালরেই বরং কইয়া দিও, সে য্যান আমাগো বাড়ি আর না যায়। আমি একই গ্যালাসে হক্কলেরে জল দিম্যু। খাইলে খাইবে, নাইলে যাইতে মানা কইর‍্যা দিও। তুমি মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া অরে ছাইড়্যা দ্যাও না ক্যান। সারাডাদিন খাওন-দাওন নাই। বেচারি বাড়ি যাইব না, না খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার বক্তৃতা শুনব অনে?

খুব কথা শিখছসত দেহি।

হ। শিখছি। কথা কি তোমার পোলায় একাই শিখছে?

কিরণশশী বললেন, ভারী পীরিততো দেহি মোছলার পুতের লইগ্যা।

শিলির বড় লজ্জা হল।

তারপর বলবে না ভেবেও বলেই ফেলল, তোমাগো কপালে আরও অনেকই দুঃখ আছে বুড়ি। যারা মানুষেরে মানুষের সম্মান এহনেও দিতে শ্যাখে নাই, তারা নিজেরাই মানুষ হয় নাই। আমার বাবায় তো হেই কথাই কয়।

তর বাবা তো মহাপণ্ডিত। তার কথা থো এখন। দয়া কইর‍্যা মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া, আমার আয়নার সামনের সিন্দুরের কৌটার ভিতর এখখানা দশটাকার নোট আছে, অরে আইন্যা দে।

পাইছস কী কী রে মাছ?

কিরণশশী শুধোলেন, আলিমুদ্দিকে, একেবারে নৈর্ব্যক্তিক গলায়। যেন, চৌকাঠের সঙ্গে কথা বলছেন।

আপনেতো কুচামাছই কইছিলেন। তা পাই নাই। বাইন মাছ, অ্যাই দেখেন দুইডা, পেরায় সাপের মতো বড় হইবনে। আর এই বাইশখান কই পাইছি। খুবই বড়। মাগুর। এক্‌খানের ওজনই হইব গিয়া পেরায় তিনপোয়া।

আর? পোলো দিয়ো আর কী পামু? আমি তো আর নদীতে জাল ফেইল্যা মাছ ধরি না।

তাইলে, আমার চিতল পামু কোত্থিকা?

মুণীন্দ্ররে কইয়েন।

কাল পারবা তো আনতে?

পারবো না ক্যান? রোজই তো ধরে দেহি, চার পাঁচটা কইর‍্যা। তবে, বেশি বড় হইব না। বড় চায়েন তো ধুবড়ি থিক্যা আনন লাগব। গরম পইড়্যা গেল গিয়া। খারাপ না হইয়া যায়।

শিলি, কিরণশশীর ঘর থেকে টাকাটা এনে আলিমুদ্দিকে দিল।

কিরণশশী বললেন, দুইটা টাকা ফেরত দিয়া যাবি। এই কয়ডা মাছের দাম দশ টাকা। তুই ডাকাইত হইয়া গেলি দেহি।

স্বল্পক্ষণ মুখ নীচু করে চুপ করে থেকে আলিমুদ্দি বলল, ঠিক আছে।

কাল দিয়া যামুআনে। এহনে তো নাই।

কাল দিলেই হইব।

আলিমুদ্দি ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

শিলি বলল, চল আমিও যাব।

এইত আইলি।

কিরণশশী বললেন।

নাঃ কাল আসুমানে।

সক্কাল কইর‍্যা আসস। আমি একা সব সামলাইতে পারুম না।

ক্যান, হোন্দলের মায়েতো আছেই।

তা হইলেও পারুম না।

তাইলে নিমন্ত্রণ করনের দরকারডা কী?

রুক্ষ গলায় বলল, শিলি।

কিরণশশী অবাক হয়ে তাকালেন শিলির দিকে। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

শিলি বুঝল, কিরণশশীর মন খারাপ। তাই মেজাজও খারাপ। শিলির নিজের মেজাজও কিছু ভালো নয়। সব সময়ে অন্যায় বরদাস্ত হয় না। আলিমুদ্দির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে শিলি বলল, ওই বুড়ির কথায় কিছু মনে করিস নাইতো তুই?

আরে নাঃ। মনে করনের কী আছে।

কিছু মনে করিস না। আজ বাদে কাল মইর‍্যা যাইব গিয়া। মানষেরে যারা এমন কইর‍্যা অপমান করে, তাদের পাপ লাগে। লাগেই!

ছাড়ান দাও দিদি। বুড়াবুড়িরা আর ক-দিন। নরেশকাকা, পরেশকাকায় তো এক্কেরে অন্য রকম মানুষ। সবাই কি সমান অইব। মোছলমানেরাও কি সবাই সমান? তুমি কও?

কথা ঘুরিয়ে, শিলি বলল, আমার বাজে বকনের সময় নাই।

তারপরই বলল, শোন। কাল দুপুরে আমাগো বাড়ি তর নিমন্ত্রণ। খাবি আইস্যা। আমাগো সাথে বইস্যা। আমি, তুই, বাবায় আর কাকায়। ছাত্তার কাকারে যদি পাওন যায় তো তারেও কয়্যা দিম্যু।

পাগল হইল্যা নাকি? দুপুরে ক্যামনে পারুম? সারাদিন মাছ না ধইরবার পারলে আম্মায় রান্ধে কী? আব্বার শরীরও তো ভালো নাই। বাতে এক্কেরেই মাইরা থুইছে। ঘর থিক্যা বাইরাইতেই পারে না। সারা দিন যা পাই, তাই বেইচ্যা বুইচ্যা চলে কোনোমতে। বুনটারে বিয়া দিতে গিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ হইয়া গ্যাছে গিয়া। তাও তো দামাদ তারে দুইবেলা ঠেঙ্গাইতেছে। আবার নিকাহ করণের ইচ্ছা আর কী! তাও গদাইদায় সুদ লয় না। ওই কর্জর সইগ্যা কখনো তাগাদাও করে না। বলে, নাইই যদি পারস, তো দিবি না। আমার তো বুন নাই। না হয় তর বোনের বিয়াটা আমিই দিয়া দিছি। হইছেটা কী তায়?

একটু থেমে, আলিমুদ্দি বলল। সত্যই। গদাইদার মতো বড়লোক দ্যাশে আর নাই। মনখান তো না, যেন ব্রহ্মপুত্রই।

শিলি, আলিমুদ্দির পাশে হাঁটছিল। শেষ বিকেলের আলো পড়ে ওকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছিল। আলিমুদ্দি ভাবছিল, এমন একটি বউ পেলে ব্রহ্মপুত্রয় নৌকো ভাসিয়ে তাকে নিয়ে মাছ ধরে একেবারে বড়লোক হয়ে যেত। কিন্তু তাতো হবার নয়। এ জন্মে হবার নয়। শিলিকে দেখলেই ওর শরীরের রক্ত দৌড়াদৌড়ি করে। শিরা উপশিরা সব শক্ত হয়ে যায়।

মোড়ে এসে ধরা গলায় বলল, চলি দিদি।

তাইলে আইবি না কাল?

ক্যামনে আসুম দিদি? রাতে একদিন কই'ন, অবশ্যই যাম্যু। তুমি আদর কইর‍্যা খাওয়াইবা আর যাম্যু না, তা কি হয়?

কাল রাতে তো এ বাড়ির নিমন্ত্রণ। আছা, দিন ঠিক ক'র‍্যা কম্যু তরে আলিমুদ্দি। অবশ্যই আসিস য্যান।

আলিমুদ্দি বাঁশবনের আড়ালে হারিয়ে গেলে, হঠাৎই শিলির মনে হল, আলিমুদ্দি কোথায় যে থাকে, তাও ও জানে না। যদিও একই গ্রামে বাড়ি ওদের, তবুও ওদের বাড়ি কখনো চোখেও দেখেনি। তবে শুনেছে, যে বাড়ি ওই নামেই। আসলে ঝুপড়ি একটি। শীতকালে চরেই ঘর বানিয়ে থাকে আলিমুদ্দি। তরমুজ ফলায়, ধানও। এই করেই কোনোরকমে চলে। ওর চওড়া বুক। পাথরের মতন হাত পা, সরু কোমর, বাঁশির মতো নাক আর মাথাভরতি চুলে, ভারী ভালো দেখে ওকে শিলি। ওকে দেখলেই বুকের মধ্যে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করে।

কিন্তু রক্তর-সঙ্গে নাচতে পারা তো যায় না। রক্ত যা বলে, তা শোনাও যায় না।

মানুষের জীবন বড়ই কষ্টের।

ভাবে, শিলি।

বাড়ি ফিরেই, গা ধুতে ঢোকে চান-ঘরে। সিঁদুরে আম গাছে বোল এসেছে। খুব তাড়াতাড়িই এসেছে এবারে। আজ কালবৈশাখী আর এলো না। মেঘ উড়ে গেছে দূরে। হাওয়া জোরে বইলেই আমের বোলের গন্ধ ভাসে আলতো হয়ে। শেষ বিকেলের রোদের সোনার আঙুল ছুঁয়েছে

গাছ-গাছালিকে এখন। একটি বসন্ত-বৌরি পাখি ডানা ঝট-পটিয়ে উড়ে যায় আম গাছের গভীর থেকে।

চান করতে করতে শিলি ভাবে যে, রাজেন ছেলেটি বেশ। কত কী জানে!

বাবা-কাকার সঙ্গে কত কী বিষয়ে আলোচনা করল সেদিন। কত জ্ঞান!

আর খুব ভদ্রও কিন্তু। দোষের মধ্যে করলুম, খেলুম, নুন, নংকা, নেবু, নুচি এইরকম অসভ্য ভাষায় কথা বলে এইই যা।

আর গান? সেদিন তার গানে সে শিলিকে একেবারেই মেরে রেখে গেছে। এরকম গান শিলি আগে কখনো শোনেনি। এমন ধরনের গানও নয়। গান যদি তেমন করে গাওয়া যায়, তবে সেই গায়ক বা গায়িকা তাৎক্ষণিক সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞীই হয়ে ওঠে। তাকে অদেয় তখন কারোই কিছু থাকে না!

একটি গান গেয়েছিল গত রাতে রাজেন। কালও এসেছিল রাতে। পুতন আসেনি। একাই এসেছিল। বাবা ও কাকা বাড়িতেই ছিলেন। কাল গেয়েছিল এই গানটি:

"ওগো কেমনে বলো না,
ভালো না বেসে থাকি গো।
পাগল করেছে মোরে
ওই দুটি আঁখি গো।
কী জানি কী গুণ করে
রেখেছে মন মজাইয়ে,
সাধ হয় সদা যেন,
বুকে করে রাখি গো।
ওগো কেমনে বলো না?"

গানটি যে শিলিকে উদ্দেশ্য করেই গাওয়া তা শিলির বুঝতে বাকি ছিল না। শিলির মনও সেদিন রাত থেকেই রাজেনকে বুকে করে রাখতেই চায়। কিন্তু এদেশের মেয়েদের তো বুকে করে রাখার অধিকার নেই; ক্ষমতাও নেই। বুকে থাকার জন্যেই তারা। রাজেনের বুকে থাকার অনেকই অসুবিধা। বৃদ্ধ বাবা, কাকা। কলকাতায় কার যেতে না ইচ্ছে করে? কোনোদিন তো যায়ওনি।

পুতনদা, কাকাকে বলেছে, রাজেনরা নাকি বনেদি বড়লোক। কলকাতায় যারা বড়লোক, তারা গদাইদের মতো গেঁয়ো বড়লোকদের দু হাজারবার কিনে যে-কোনো হাটে আবারও বেচে দিতে পারে নাকি। রাজেনদের অনেকগুলো গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি আছে 'রোলস'। সেই গাড়িটিরই যা দাম, তাতে গদাই আর গদাইর বাপের সব সম্পত্তি নিলামে চড়ানো যায়। রাজেনও বাবার এক ছেলে। তবে, ছেলের স্বভাব চরিত্রটি সুবিধের নয়।

শিলি, গায়ে সাবান দিতে দিতে ভাবছিল, ওর মা বলতেন, ছেলেদের চরিত্র কখনো নোংরা হয় না। অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই পুরুষ মানুষকে ছোট বলা যায় না। যদি সে ছোট মনের মানুষ হয়, তবেই শুধু ছোট বলা যায় তাকে।

ছোটমনের পুরুষমানুষের মতো ঘৃণিত জীব আর নেই।

চান সেরে গা মুছছিল যখন, তখন কাদের গলায় আওয়াজ পেল যেন বাইরে।

রাজেন আর পুতন? বুকটা ধক করে উঠল শিলির।

তারপরই বুঝল যে, শুধুই রাজেন।

তাড়াতাড়ি করে জামাকাপড় পরে ফেলল ও। রাজেনের সামনে অসুন্দর হয়ে যেতে চায় না।

নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে, যে-মানুষটিকে দু চোখে দেখতে পারত না কদিন আগেই, সেই মানুষটিই এখন তার মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার পাশে, পুতনদাকেও মনে ধরে না আর। এ কী শুধু গানেরই জন্যে? নাকি মানুষটি যে খারাপ, দুশ্চরিত্র এ সব শুনেছে বলেই, তার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছে ও। যে মানুষেরা নিজেদের সবসময়ই ভালো বলে প্রমাণ করতে চায়, আসলে তাদের মধ্যে বেশিরাই বোধহয় খারাপ। শিলির অভিজ্ঞতা তাইই বলে। ভালো মানুষ, বড় সহজে খারাপ হয়ে যেতে পারে, যেমন পুতনদা হয়েছে। কিন্তু যাকে খারাপ বলেই জানা আছে, তার আরও খারাপ হবার ভয় থাকে না কোনোই। বরং ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। খারাপ যদি ভালো হয় তখন সে বোধহয় ভালোই থাকে বাকি জীবন। খারাপের উপর ভরসা করা চলে, ভালোর উপরে কখনোই নয়, কারণ, কোন মুহূর্তে যে সে খারাপ হবে, তা নিজেও আগের মুহূর্তে জানে না।

শিলির মা, একজনকে ভালোবাসতেন। আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ছিল তাঁর। একবার মাত্র তিনি মাকে দেখতে এসেছিলেন কুমারগঞ্জে। নাম ছিল সুধীর। শিলি ডাকত সুধীরমামা বলে। দুদিন ছিলেন ওদের বাড়িতে।

বাবা সে দুদিন নানা অছিলাতে ইচ্ছে করেই বাড়ির বাইরে ছিলেন। সুধীরমামা চলে যাওয়ার পর মা বলেছিলেন, তোর বাবা মানুষটা বড় উদার রে শিলি। এমন পুরুষ, সব মেয়েরই শ্রদ্ধার পাত্র।

সুধীরমামা এঁচড়ের চপ খেতে ভালোবাসতেন বলে দুদিনই বিকেলে এঁচড়ের চপ করেছিলেন মা। মনে আছে শিলির।

একদিন আলিপুরদুয়ার থেকে খবর এল পোস্টকার্ডে যে, সুধীরমামা কুমারগঞ্জের দিকেই আসছিলেন শিলির মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। স্টেশনে নেমে, বাস ধরার আগেই রক্তবমি করে প্ল্যাটফর্মেই মারা যান। অচেনা মানুষের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ। কাটা-ছেঁড়া হয়। সাতদিন পরে সুধীরমামার ছোটভাই লোকমুখে খবর পেয়ে মর্গে পৌঁছে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। সুধীরমামা তখন আর সুধীরমামা ছিলেন না। গলে, ফুলে, পচে সে নাকি এক বীভৎস ব্যাপার। ওইখানেই দাহ করে ফিরে যান তাঁর ভাই।

গিয়েই মাকে একখানা পোস্টকার্ড লেখেন।

সুধীরমামাও খুব মদ খেতেন। বিয়ে-থা করেননি। মামাবাড়ির আত্মীয়দের কানাঘুষোয় সে শুনেছে, মাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি বিয়ে করেননি। পুববাংলার একই গ্রামে বাড়ি ছিল ওঁদের। মায়ের নিজের নামে না ডেকে সুধীরমামা মাকে ডাকতেন "পারু" বলে। দেবদাসের পার্বতী।

জীবনের শেষটাতে অনেকেই মিল ছিল দেবদাসের সঙ্গে।

শিলির মা বলতেন, তোর বাবা কাঠ-খোট্টা মানুষ। প্রেমের মতো গভীর ব্যাপার ওঁর জন্যে নয়। তবে, প্রত্যেক মানুষেরই প্রেমের প্রকাশ আলাদা আলাদা। সুধীরমামার মৃত্যুর পর বাবাই ওদের বাড়িতে এঁচড়ের চপ কোনোদিনও আর করতে দেননি। মাকে বলতেন, সুধীরবাবু খেতে অত ভালোবাসতেন। ও জিনিস আর নাইই বা করলে।

সুধীরমামাও কিন্তু দারুণ ভালো গান গাইতেন। যে দুদিন ছিলেন, গানে গানে মুখর করে রেখেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। শিলির খুব অবাক লাগত তখন, ওই মাকে দেখে। মা যেন অন্য মা হয়ে গেছিলেন। এক অচেনা মানুষ।

সুধীরমামা চলে যাবার পর, মা বলেছিলেন একদিন শিলিকে ডেকে, দ্যাখ শিলি, প্রেমে যদি কোনোদিনও পড়িস কারও সঙ্গে, সত্যিকারের প্রেম রে, মোহ নয়, তবে তাকে কখনো বিয়ে করিস

না। বিয়েটা একটা অভ্যেস। অন্ধকার ঘর। আর প্রেম হচ্ছে আলোকিত বারান্দা। যেখানে পাখি ডাকে, ফুলের গন্ধ ভাসে।

শিলি শুধিয়েছিল, কী করে বুঝব মা, যে, প্রেমে পড়েছি?

মা হেসে, শিলির থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছিলেন, বুঝতে ঠিকই পারবি।

প্রেম যেমন আনন্দর, তেমন বড় কষ্টেরও। প্রসব বেদনার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট প্রেমে। প্রেম এলে, ঠিক বুঝবি। যদিও শব্দ করে, জানান দিয়ে আসে না প্রেম।

তবে? মানুষে প্রেমে পড়ে কেন? অত যদি কষ্টই?

হেসেছিলেন মা।

বলেছিলেন, না-পড়ে পারে না বলেই পড়ে।

রাজেন বারান্দাতে বসেছিল। রাজেন একাই। পুতন বোধহয় পৌঁছে দিয়েই চলে গেছিল। যে-কোনো কারণেই হোক, পুতনদা কয়েকদিন হল এড়িয়ে যাচ্ছিল শিলিকে।

শিলি বলল, বসুন একটু। আসছি।

বলেই ভিতরে গিয়ে চুলটা ঠিক করে, চোখে কাজল দিয়ে এল।

বাবা আর কাকা একসঙ্গেই বেরিয়েছিলেন। গজেন কাকাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার সালিশি হয়েছেন ওঁরা। রোজই একবার করে যাচ্ছেন কদিন হল।

আজকে মিটিয়ে দিয়ে আসবেন, এমনই কথা আছে।

শিলি এসে বসল, রাজেনের সামনে।

বলল, কী করলেন? সারাটা দিন?

কিছুই করলাম না। অথচ দিনটা চলে গেল। এই কথাই ভাবছিলাম। আমার মতো উদ্দেশ্যহীন লোকের দিনতো বটেই, জীবনও বোধহয় এমনি করেই চলে যাবে। চলে যাবার সময়ই শুধু জানতে পারব যে, চলে গেল।

তাই?

শিলি বলল।

আমি কালই ফিরে যাচ্ছি। চা-বাগানে।

শিলির বুকটা ধক্ করে উঠল। মনে হল যেন কোনো স্বপ্ন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। প্রথমটা, কোনো কথাই বলতে পারল না শিলি। তারপর সামলে নিয়ে বলল, সাতবোশেখির মেলা দেখে যাবেন না। মেলার মুখেই চলে যাবেন?

যেতে যখন হবেই, তখন মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী?

মায়া? কীসের মায়া?

মুখ নামিয়ে বলল, শিলি।

এই! কুমারগঞ্জের মায়া। এখানের মানুষজনের মায়া।

ওঃ।

এখানের মানুষজনকে ভালো লাগল না বুঝি?

না। না। তার জন্যে নয়। হয়তো উলটোটাই। বেশি ভালো লাগলেও চলে যেতে হয়। চলে যাওয়াই ভালো।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি, কলকাতায় কখনো যাওনি, না?

না।

কখনো কি যাবে?

আমরা গেঁয়ো লোক। তার উপরে কলকাতায় তো আমাদের আত্মীয়স্বজনও কেউই নেই। থাকার জায়গাই বা কোথায়? তাছাড়া বিনা কাজে বেড়িয়ে বেড়াই এমন সামর্থ্যও তো আমাদের নেই। বাবা কাকারও আমি ছাড়া কেউই নেই। ওঁদের কে দেখবে?

আমি আমার মাকে লিখেছি তোমার কথা।

আমার কথা? আমার কথা কী লিখেছেন?

এই! যা মনে হয়েছে।

কবে লিখেছেন?

যেদিন তোমাদের বাড়িতে খেয়ে গেলাম, সেদিনই রাতে। তোমার গান শোনার পর।

আমার কথা লেখার কীইই বা আছে। লেখাপড়া শিখিনি। কোনো গুণ নেই। আমি অতি সামান্য মেয়ে।

সেই কথাই লিখেছি। তোমার গানটা ভালো করে করা উচিত শিলি।

আমার কোনোই গুণ নেই। বড়লোকের বকা ছেলে বলেই সকলে আমাকে জানে। আমার দোষের শেষ নেই। কিন্তু গান আমি ভালোবাসি। এবং নিজের কথা অন্য কেউই এখানে বলার নেই বলেই বলছি; যে গান ব্যাপারটা আমি একটু-আধটু বুঝি। তুমি গান ভালো করে শিখলে, দেশের নামি গাইয়েদের একজন হতে পারো। ভগবান-দত্ত গলা তোমার। তুমি কি রিয়াজ করো কখনো?

রিয়াজ? জীবনে করিনি।

তবেই দ্যাখো। ঠিকই ধরেছি। কিছু গাইয়ে থাকেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁদের অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে, অন্যদের হ্যান্ডিকাপ দিয়ে আসরে নামান তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে।

হ্যান্ডিকাপ কী?

ও। সে তুমি বুঝবে না। ও ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার। রেসের মাঠের টার্ম। আমি তো রেসের মাঠেও যাই। সব গুণই তো আছে।

কী হয়? সেই মাঠে?

হেসে ফেলল রাজেন, শিলির নিষ্পাপ অজ্ঞতায়।

বলল, সে তুমি যখন কলকাতায় যাবে, তখন জানবে। তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখিয়ে আনব। তোমাদের এখানে যেমন আমার বিস্ময়ের অনেক কিছুই আছে, গঙ্গাধর নদী, রাঙামাটি, পর্বতজুয়ার, আলোকঝারি, আমার অদেখা সাতবোশেখির মেলা এবং তুমি, এই শিলি। তেমন, তোমারও বিস্ময়ের অনেক জিনিসই আছে কলকাতায়।

আমি কলকাতায় যাব কেন হঠাৎ? ঠিক বুঝলাম না।

আমার মা তোমাকে চিঠি লিখবেন, নেমন্তন্ন জানিয়ে। আর আমার বাবা লিখবেন তোমার বাবাকে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গেই যাবে। পরেশকাকাকেও নিয়ে যেও। ওখানে কত বড় বড় বন্দুকের দোকান আছে। ওঁকে দেখাব। আমার ছোটমামারও খুব শিকারের শখ ছিল। ছিল কী, এখনও আছে। বিহারের হাজারীবাগ, উড়িষ্যার ঢেনকানল ইত্যাদি কত জায়গাতে শিকারে যান উনি, প্রতি শীতে। পরেশকাকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন উনি।

কেন? আমাদের নেমন্তন্ন করবেন কেন, আপনার মা-বাবা?

আমার তোমাকে খুব ভালো লেগেছে বলে। মানে, তোমাদের সকলকেই।

তাই?

বলে, বড় বড় চোখ মেলে শিলি চেয়ে রইল, রাজেনের মুখের দিকে বিস্ময়ে।

ওর বুকের মধ্যে দারুণ এক উত্তেজনা বোধ করতে লাগল ও।

হঠাৎ রাজেন বলল, তোমার বিয়ে কবে? শিলি?

বড় কষ্ট হল রাজেনের কথা শুনে শিলির। একটু আগেই বুকে যে আনন্দর বোধ চিড়িক করে উঠেছিল, তাই হঠাৎ বেদনার বোধ হয়ে গেল।

সামলে নিয়ে বলল, আমার বিয়ে? কে বলেছে, আপনাকে?

অনেকের কাছেই তো শুনছি। তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করো কিন্তু। আর বিয়ের আগেই একবার কলকাতা বেড়িয়ে যেও। আমাদের নায়েবমশাইকে পাঠাবেন বাবা, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।

আমার বিয়ের কথা শুনেছেন, কিন্তু পাত্রটি কে?

বেশ মজা লাগছিল শিলির। মজার গলাতেই বলল।

পাত্র?

হ্যাঁ।

পাত্র দুজন আছেন বলে শুনেছি।

এবারে শিলি হেসে ফেলল।

বলল, ও তাহলে বিয়েটা পাকা হয়নি এখনও? তাছাড়া পাত্র একজন নয়, দুজন? একেবারে স্বয়ংবর সভা যে!

বোকা বনে গেল রাজেন।

বলল, হয়তো তাইই।

পাত্রই যখন ঠিক হয়নি এখনও, তবে তো বিয়ে নাও হতে পারে।

শিলি বলল।

তা নয়। শুনেছি, বিয়ে হবেই। এবং শিগগির।

পাত্র তাহলে দুজনের জায়গায় তো চারজনও হতে পারে। পাকাই যখন হয়নি।

এবারে হেসে ফেলল রাজেন। আনন্দে।

বলল, তাই?

তাইই! তবে আমার বাবা ছাড়া তো আমার কেউই নেই। বাবাকে ছাড়া কোথাও যেতে পারব না। আর পারব না বলেই, বোধহয় বাবা কাকা আমার জন্যে এখানেরই কোনো পাত্রর কথা ভাবছেন। আমার না আছে রূপ, না আছে কোনো গুণ। লেখাপড়াও শিখিনি বলার মতো। আমার বাবার টাকাও নেই। আমার যেমন যোগ্যতা, তেমন পাত্রই আমার জুটবে।

পুতনকে তোমার কেমন লাগে শিলি?

হঠাৎ বলল, রাজেন।

শিলি চুপ করে রইল।

কী? কিছু বলছো না যে?

সত্যি কথা বলব? আপনি কথাটা নিজের কাছেই রাখবেন তো?

নির্ভয়ে বলো।

খুবই ভালো লাগত। পাশাপাশি বাড়ি। তাছাড়া বড় হবার পর বেশি ছেলেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ তো পাই না আমরা, এই গাঁয়ের মেয়েরা। তাই পুতনদাকেই দেখেছি ছোটবেলা থেকে। খুবই ভালো লাগত। পড়াশুনোতেও ভালো। আমাদের গর্ব। তার মায়েরও গর্ব। পুতনদার মাও আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এই পুতনদা মানে, যে পুতনদা আপনার সঙ্গে এবারে এল, তাকে আমার ভালো লাগেনি। অনেকেই বদলে গেছে পুতনদা।

রাজেন বলল, ওকে আমিই বকিয়ে দিয়েছি। দোষ আমারই। ও সত্যিই ভালো ছেলে। আমার সংশ্রব ছাড়লেই ও আবার তোমার পুরানো পুতনদাই হয়ে যাবে।

জানি না। যাদের যে-কেউই এত সহজে নষ্ট করতে পারে, তাদের উপর ভরসা কি করা যায়? আসলে, পুতনদার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবার প্রবণতা ছিল নিশ্চয়ই। নিজে নষ্ট না হতে চাইলে, অন্যে কি নষ্ট করতে পারে কাউকে?

নিশ্চয়ই পারে শিলি। এই যেমন তুমি। এক রাজেন এখানে এসেছিল, তুমি তাকে আবার নষ্ট করে অন্য রাজেন করে দিলে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে নষ্ট হবারও নানা রকম থাকে তো!

শিলি, আহত গলায় বলল, আমি? আমি আপনাকে নষ্ট করে দিলাম? কী বলছেন আপনি?

দিলেই তো। নষ্ট হওয়া মানে, সবসময় খারাপ হওয়া নয়। পুরনো যা, তা নষ্ট তো হলই। বদলে যাবারও তো আর এক নাম নষ্ট হওয়া! না, কি?

শিলি চুপ করে রইল। মুখ নামিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে, নিজের আঙুলে আঁচলের কোণটি পাকাতে পাকাতে বলল, আমি; আমি....।

ওর দিকে চেয়ে খুব ভালো লাগছিল রাজেনের। কলকাতার কোনো মেয়ে এমন করে আঁচল আঙুলে পাকালে তাকে অভব্য-অসভ্য বলা হত। অথচ এই চাঁদ-ভাসি উঠোনের এক কোণের বারান্দায়, এই গ্রাম্য মেয়েটির আঙুলে আঁচল পাকানো দেখে রাজেনের মনে হল, এর চেয়ে বেশি ভদ্র, স্বাভাবিক অভ্যেস আর কিছুই হতে পারে না। সেখানে যা মানায়, যা রেওয়াজ।

একটু পরই পুতন ফিরে এল।

শিলি বুঝল ও চলে যায়নি, হয়তো কিছু কিনতে টিনতে গেছিল।

পুতন হাঁটিয়ে-আনা সাইকেলে, কির-র-র-র শব্দ তুলে উঠোনে ঢুকল।

বলল, হুইস্কি পেলাম না গুরু, রাম এনেছি।

রাজেন উঠল। বলল, এখানে নয়। শিলি বাড়িতে একা আছে। তাছাড়া শিলি পছন্দ করে না এসব।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দাও পুতন।

যাঃ বাবা। ভূতের মুখে রামনাম!

তাইই! ভূত যে ভগবান হয়ে ওঠে কখনো কখনো, তাও ত সত্যিই।

কী ব্যাপার?

কেন? ভূত ভগবান হতে পারে না?

অবাক হয়ে রাজেনের সঙ্গে চলে যেতে যেতে পুতন শিলিকে বলল, শিলি, তাহলে এই কথাই রইল। দেখা হবে সাতকোশেখির মেলায়।

রাজেন কিছুই বলল না পুতনকে, সেই কথার পিঠে। শিলিকেও নয়।

শিলি অবাক হল!

রাজেন বলল, চললাম শিলি। ভালো থেকো। খুশি থেকো, সবসময়ে।

হঠাৎ এই সব কথা? সময় কি চলে যাচ্ছে নাকি?

পুতন বলল।

তারপর বলল, এখান থেকে যেদিন যাবে, সেদিনই এইসব ফেয়ারওয়েলের কথা হবে এখন। অনেকই হবে। ফুল, মালা, চোখের জল।

রাজেন উত্তর দিল না।

শিলি, চ্যাগারের দরজা অবধি এল ওদের সঙ্গে। যাবার সময়ে রাজেন খুব কাছ থেকে শিলির মুখে তাকাল একবার।

তারপর আবারও বলল, মাঝে মাঝে গানের রিয়াজ করলে ক্ষতি কী? ভেবে দেখো।

তারপরই নীচু গলায় বলল, ভালো থেকো শিলি।

ভালোবেসে, কাউকে ভালো থাকতে বলার মধ্যেও যে এত লজ্জা, এত সুখ থাকতে পারে, তা রাজেনের জানা ছিল না।

ওরা দুজনে জ্যোৎস্নার মধ্যে বাঁশপাতা-ঝরা আলো-ছায়ার ডোরাকাটা শতরঞ্জি মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পুতন আর রাজেন। সাইকেলের চেনের কিরকির শব্দ হচ্ছিল। আমের বোল-এর আর কাঁঠালের মুচির গন্ধে ম'ম' করছিল চাঁদভাসি, কুমারগঞ্জ। কোকিল ডাকছিল, কাক-জ্যোৎস্নাকে দিন ভেবে। পাগলের মতো। কোকিলদের মধ্যেও পাগল থাকে। আর বউ-কথা-কও।

শিলির দুচোখের সামনে দিয়ে, যেন রাজেন নয় মায়ের প্রেমিক সুধীরমামাই জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে চলে গেলেন।

মা চলে গেছেন। সুধীরমামাও গেছেন আরও আগে। মানুষ ঠিকই মরে যায় একদিন না একদিন, কিন্তু প্রেম থেকে যায় অন্যের মধ্যে। প্রেমিক প্রেমিকার রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রেমিক একই থাকে। দিদিমা, মা অথবা মেয়ের। জন্মে জন্মে তাদের চেহারা এবং নাম বদলায়। রকমের বদল বোধহয় না।

হঠাৎই কুচিন্তায় মন ভরে উঠল শিলির।

শিলির মন বলল, রাজেন আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না এই কুমারগঞ্জে; শিলির কাছে। কে জানে? আসবে কি?

মনে এ কথা হতেই মনে মনে, সেই মনের মুখ চেপে ধরল ও।

ওরা দুজন বড় রাস্তায় পড়ে চাঁপার মাঠের দিকে যেতে লাগল। চাঁপার গন্ধে ম'ম' করে জায়গাটা। তাই খুবই পছন্দ করে পুতন। ওখানে বসেই মাল খাচ্ছে গত তিনদিন হল ওরা।

পুতন বলল, গুরু? কী হল তোমার? মনমরা দেখছি যে। আর কী? যে জন্যে আসা সেই কারণ তো সিদ্ধ হবে এবারে। কিছু বল গুরু!

গুরু তো ছিলে তুমিই? আমি আবার গুরু হলাম কবে থেকে।

রাজেন বলল।

তোমার নিজের গুণেই।

পুতন বলল।

হেসে ফেলল, রাজেন।

বলল, তাইই?

পুতন বলল, ভিলেজ-বিউটির নথ কবে খসাবে? কেস তো একেবারে তৈরি করেই ফেলেছ। ওকে নষ্ট করবে বলেই তো এখানে আসা তোমার। পারোও বাবা তুমি। শিকারি বাঘও তোমার মতো ধৈর্য রাখে না। অসীম ক্ষমতা তোমার। খুরে খুরে পেন্নাম।

হুঁ।

পথেই খাবে নাকি? খুলব পাঁইট?

অধৈর্য গলায় বলল, পুতন।

নাঃ। আমি খাব না।

রাজেন বলল, অন্যমনস্ক গলাতে।

সে কী? এ কী কথা? সন্ধেবেলা ওষুধ না খেলে শরীর ম্যাজম্যাজ করবে না? আমি তো খাবই। তুমিই আমাকে ধরিয়ে, এখন তুমিই...বাঃ।

এ সব না-খাওয়াই ভালো। পরে, এইই খায়।

যাঃ শালা। বলছ কী তুমি গুরু? যাকগে, কাল অবধি তো খাও। তারপর দেখা যাবে এখন। গুড়ি-গুড়ি বয় হওয়া যাবে।

আরে! সাতবোশেখির মেলার দিনেই তো ক্লাইম্যাক্স হবে। না খেলে, চলবে কেন? প্ল্যানটা কী করলে শুনি?

কীসের প্ল্যান?

বাঃ প্ল্যানটা যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারো। তাইত তোমাকে একা পাঠালাম আগে। কীসের প্ল্যান আবার কী?

শিলিকে নষ্ট করার প্ল্যান।

ওঃ।

বলেই, চুপ করে গেল রাজেন।

মনে মনে বলল, এ কথা ঠিকই যে, ওকে নষ্ট করতেই এসেছিলাম। কিন্তু নিজেই নষ্ট হয়ে গেলাম। অথবা, কে বলতে পারে; অমৃত হয়ে গেলাম।

রাজেন, পুতনকে বলেনি যে, কাল ভোরের বাসেই ফিরে যাবে ও। অনেকই কাজ বাকি আছে। সময় বেশি নেই।

পুতন বলল, তুমি কথাবার্তা কইচো না যে!

বলল, একেবারেই কলকাতার লোকেদেরই মতন। ওই ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে, পুতনের খুব গর্ব হয় আজকাল। কিছু মেকি মানুষ, মেকি-বাঙাল তাঁদের মাতৃভাষার ব্যাপার একধরনের হীনমন্যতাতে ভোগেন। পুতনও তাদেরই দলে। ব্যতিক্রম নয়। মেকিরাই তো এখন দলে ভারী সব জায়গাতে। তাদেরই রাজত্ব। অথচ একদিন পুতন ঘৃণা করত। আজ সে তাদেরই একজন।

তবুও রাজেন কথা বলল না।

কী গুরু? উত্তর দিচ্ছ না যে কথার?

রাজেন হাসল এবারে।

বলল, জানো পুতন আমি না মাইরী, আলোকঝারি হয়ে গেছি।

পুতনের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল রাজেন।

সে আবার কী?

সত্যিই। আলোকঝারি।

তারপর বলল, আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।

আরে এখনই কী! কালকে কম্মো ফতে হোক। তার পরে না! কেস যেমন তৈরি করেছ, তাতে তো জোর খাটাতেও হবে না দেখছি।

রাজেন হাসল।

মুখে কিছু বলল না।

হাসিটা, চাঁদের আলোতেও অদ্ভুত ঠেকল পুতনের।

মনে মনে বলল, অনেকই দিন জোর খাটিয়েই পেয়েছি মেয়েদের। গায়ের জোর, টাকার জোর, বুদ্ধির জোর। এবারে পাব জোর না-খাটিয়েই। হেরে যাবে এবারে। যে-সব জেতাকে, আমি জেনে এসেছিলাম, তারা যে সবই সস্তা জয়ের রঙ-করা হার, আত্মাবমাননাই একরকমের, তা আমি আজ জেনেছি। সসম্মানে জিতবে এবার।

কী হল গুরু। কতা কও। হলটা কী তোমার?

আর কথা? সত্যি পুতন। আমি নিজেই আলোকঝারি হয়ে গেছি তোমাদের দেশে এসে। সত্যিই!

কেন? আলোকঝারি কেন?

এত আলো, এত আনন্দ; আমার মধ্যে সত্যিই হাজারো ফোয়ারা খুলে গেছে। তা থেকে দিন রাত শুধু আলোই ঝরে। খুশিও! এও কি এক আলোকঝারি নয়? আমার মন? এই আমিকে কি আমি জানতাম?

পুতন ভাবছিল, একই মানুষের অনেকগুলো মানুষ থাকে বোধহয়। বোধহয় নয়; অবশ্যই থাকে।

রাজেনের মধ্যে থেকে এ কোন মক্কেল হঠাৎ বেরিয়ে এল মাল না খেয়েই, এমন হেঁয়ালি শুরু করল, কে জানে! কলকাতার মালেদের বোঝাই মুশকিল। কিরণশশীর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়, খিটক্যাল। কী খিটখ্যাল।

ভাবছিল পুতন।

দূরের আলোকঝারি পাহাড়টা চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি হয়ে গেছিল। আর দুদিন পরেই পূর্ণিমা। পাহাড় থেকে নানা রাত পাখি আর নিশাচর জানোয়ারদের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের চলে-যাওয়া দেখে এসে, শিলি বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আলোকঝারির দিকেই চেয়েছিল। আজ বিনুনি বেঁধেছিল ও। এক বিনুনি। বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে, বুকের উপর ছেড়ে দিয়েছিল কালো, চিকন সাপের মতন। শ্বেতকরবী গুঁজেছিল বাঁ কানের পেছনের চুলে।

ভাবছিল শিলি, সুগন্ধি ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, স্বপ্নে সাঁতার দিয়ে, এক অচেনা স্বপ্নের দেশে ভেসে যাচ্ছিল ও।

আলোকঝারি থেকে উড়ে-আসা ময়নামারীর বিলের দিকে চলে যাওয়া, ঘাড়ে কেশর ঝোলানো সাদা হেরনরা কোয়াক কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেমন করে ভেসে যায়, তেমনই উড়ে যাচ্ছিল শিলি, নিঃশব্দে।

এই মুহূর্তে মাকে বড়ই মনে পড়ছিল ওর।

মা আজ পাশে থাকলে বড় ভালো হত। মা যে ওর মধ্যেই ছিলেন আর রাজেনের মধ্যে সুধীরমামা।

এ কথা মনে করেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিল ও।

রাজেনকে ও মরতে দেবে না।